Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

শ্রমজীবী জনসমষ্টির স্বদেশ বলে কোন বস্তুই নেই, যা তাদের আদপেই নেই তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারি না। যেহেতু সর্বহারাদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির অগ্রচারী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে একক জাতিরূপে, সে অর্থে তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যই জাতীয়—

—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

গণবার্তা

সূচি.......... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়	১
শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে	১
দেশে বিদেশে	২
নির্যাতন, ধর্ষণ কী পরিকল্পিত	৩
পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতি....	৪
এই ধর্ষক উপত্যকা...রুখে দাঁড়ান	৫
জেসিবি মেশিন দিয়ে বস্তি উচ্ছেদ	৬
রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ আবেদন	৭
ধর্ষণ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ	৮

68th Year 49th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 16th & 23th April 2022 [Joint Issue]

সম্পাদকীয়

রাজ্যের দুর্নীতি : বিজেপি-তৃণমূল-কর্পোরেট-প্রশাসনের সুগভীর চক্রান্ত

আমাদের রাজ্যে পুকুর ভরাট, নদী বক্ষ থেকে বালি উত্তোলন, বেআইনি খনিজ পদার্থ খনন, পাহাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে পাথর চুরি, কৃষিজমি জবরদখল করে আবাসন ও ভেড়ি নির্মাণ ইত্যাদি অজস্র লুণ্ঠন চলছে অবাধভাবে। সংবাদ মাধ্যমের কৃপায় আমরা যতটুকু জানতে পারি তা হিন্দুধর্মের চূড়া মাত্র। তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের অনুপ্রেরণায় দুর্বৃত্তদঙ্গল, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব, পরিবহন, শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তরের আমলাদের এবং পুলিশের একাংশ সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের ঘটনার ভাগীদার। অতিনিষ্ঠাভাবে লুণ্ঠিত সম্পদ সংগ্রহ, বন্টন এবং তথ্য প্রমাণ লোপাট করার দায়িত্ব পালন করছে এই সংগঠিত দুষ্টচক্র।

তাই যে কয়টি ধর্ষণ, খুন, সিন্ডিকেটের হানাহানি, পৌরসভা ও নিগমের চেয়ার দখল নিয়ে খুনোখুনির ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে, তা প্রকৃত অপরাধ ও সন্ত্রাসের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

পুঁজিবাদী সংকট থেকে সাময়িক আরোগ্য পেতে যুদ্ধ ও সামরিক অর্থনীতি এবং সন্ত্রাসের প্রতিনিয়ত জোগান ও চাহিদার ভয়ংকর অমানবিক পথগ্রহণ করছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। আমাদের রাজ্যেও বিশিল্পায়ন ও বন্ধ্যা অর্থনীতি সহ বেকারত্ব, কৃষকের দুর্দশা, চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিষয়ে চোখ বন্ধ রেখে দুর্নীতি নির্মাণ ও চাহিদা বজায় রাখছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। রাজ্য সরকার সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, সংখ্যালঘু ও দলিত সমাজের সার্বিক উন্নয়নের বিশাল শূন্যতা বাজেট- বরাদ্দের অর্থকে অনৈতিকভাবে খেলা-মেলা, পুজাপার্বণ ও ক্লাবকে অনুদান, দানধ্যান, বিভিন্ন 'শ্রী' পুরস্কার আর বাহ্যিক সাজসজ্জার কাজে ঢেলে দিচ্ছে।

বামদলগুলি বারবার বলার চেষ্টা করেছে যে এই সমগ্র প্রকল্পটি খুবই সুপরিকল্পিত ধরনে রচিত। দেশি বিদেশি কর্পোরেটদের সঙ্গে ক্রোনিপুঁজিপতিদের দঙ্গল ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই শুধু নয়, আরো অনেকেই জড়িত। প্রথমেই বলা যায় প্রচার মাধ্যমের কথা। দুর্নীতির শিকড় না খুঁজে বাজার গরম করা খুনখারাপিসহ আইনশৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে প্রচার করছে। কিন্তু তা আসলে মূল বিষয়গুলি থেকে রাজ্যবাসীর নজর সরিয়ে বিভ্রান্ত করার কায়দায় তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপি'র বাইনারির পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে।

এদিকে খুব সুচারুভাবে বিজেপি রাজ্যে ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারার আওয়াজ তুলছে। এভাবে রাজ্যপাল সহ সিবিআই, ইডি ইত্যাদি শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নয় বিজেপি'র মুখ হয়ে উদ্দীপ্ত বাইনারিটা বজায় রাখছেন। এবার তৃণমূল-বিজেপি, রাজ্যপাল- প্রচারমাধ্যমের বোঝাবুঝিটা স্পষ্ট হয়েছে 'বাগটুই-হাঁসখালি' ইত্যাদির আড়ালে বিধানসভায় পেশ হওয়া কেন্দ্রীয় অডিট সংস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাজ্যের অর্থনীতি ও দুর্নীতির রিপোর্টটাকে প্রচারের আলো থেকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ায়।

শোনা যায় রাজ্যপালের নিয়মানুগ অনুমতি সহ কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনেরাল অফ ইন্ডিয়া তিন পর্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করেছে। এতে রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরের খরচ, রাজস্ব, ঋণ, বিভিন্ন খাতে ব্যয় কিভাবে করা হয়েছে, তার বিশদ হিসাবই নয় বিশ্লেষণও আছে। বিচ্যুতি সংশোধনের পথও দেখানো হয়েছে।

৮০০ পৃষ্ঠার রিপোর্টের মধ্যে মাত্র ৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টে যতটুকু দুর্নীতির ছবি ধরা পড়েছে, হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই যেমন বোঝা যায়— সেরকমই সারা রাজ্যের ছবিটা কি সহজেই অনুমেয়। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের রাজস্ব সংগ্রহে ব্যর্থতায় কম করেও ২৫ কোটি টাকা লিজ সারচার্জ সেস সংগ্রহ করা যায় নি। জবরদখল করা জমি বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করা সত্ত্বেও জমি মাফিয়ারা রাজস্ব দেয় নি।

পথে ঘাটে ট্রাফিক পুলিশকে টাকা আদায় করতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। অথচ রাজ্যের ১,২২,৯৫৫টি ক্ষেত্রে ৩২০ কোটি টাকা কর আদায় করা যায়নি। ভূমি রাজস্ব দপ্তরেরই প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে জবরদস্তি জমি, বালি ইত্যাদি উত্তোলনের জন্য সরকারের ক্ষতি হয়েছে কম করেও ৪০ কোটি টাকা।

সুতরাং স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে এই গভীর দুর্নীতি ও বাইনারি নির্মাণ একটি সুপরিকল্পিত লুঠেরা অর্থনীতি-রাজনীতির চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন-এর ১৫৩তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

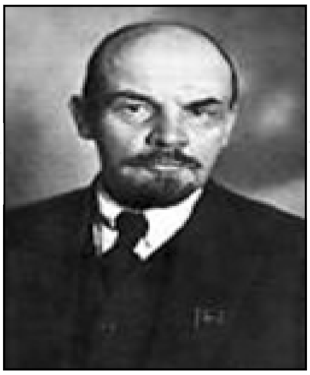

জন্ম : ২২ এপ্রিল ১৮৭০ ; মৃত্যু : ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

নতুন করে দেশভাগের চক্রান্তে লিপ্ত মোদি সরকার

শ্রমজীবী মানুষকেই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে

সারা দেশ জুড়ে মানব সমাজকে নিবিড়ভাবে বিভাজিত করার চক্রান্ত চলছে। ২০১৪ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির অন্যতম প্রধান নায়ক নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই পরিকল্পনামাফিক এমন মানবসভ্যতা বিরোধী অপকর্ম চলছে। জাতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রসার ঘটিয়ে ভারতের জনসমাজকে এক বর্বরযুগে পৌঁছে দেবার অনৈতিকতা দেশের কেন্দ্রীয় সরকার অবলীলায় করে চলেছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারিগররা খোদ সরকারের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ভারতকে হিন্দি-হিন্দু- হিন্দুস্থানে অবনত করার প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হবার উপক্রম। সভ্যতার প্রাথমিক শর্তগুলি পর্যন্ত গভীর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বিকার। এমনকী তার 'মন কি বাত' কার্যক্রমেও এ প্রসঙ্গে কোনো আশঙ্কা ব্যক্ত হচ্ছে না।

২০১৯ সালে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চক্রান্তমূলকভাবেই নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইন বলবৎ করে দেশের মানুষকে ধর্মমতের ভিত্তিতে বিভাজিত করার অপপ্রয়াস করেন। সি এ এ, এন আর সি প্রভৃতি নিয়ে সারা দেশের মুসলিম সমাজ আলোড়িত হয়ে ওঠে। আইন করে ইসলাম ধর্মের মানুষদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সেই আইন আজ পর্যন্ত বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। দেশের সংবিধানের মূল ধারণাকেই নস্যাৎ করে এমন আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল মূলত উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের আরও উৎসাহ দেবার লক্ষ্যেই। আইন সংক্রান্ত বিধিগুলি রচনা করতে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই ব্যর্থতা কিছুটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে। কারণ, অমিত শাহ বা নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য আইনের শাসন নয়। তাঁরা এমন একটি বিতর্কমূলক আইন প্রবর্তন করে সংখ্যালঘু মানুষদের আতঙ্কিত করার অপচেষ্টা করেছিলেন। আর মুসলিম সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে বিপদগ্রস্ত করার বিপক্ষে প্রতিবাদী আন্দোলন হলেই হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ত সংগঠনগুলির আক্রমণ সংগঠিত করা সহজতর হয়। হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে একে অন্যের বিরুদ্ধে রণংদেহি মূর্তিতে দাঁড় করানো সম্ভব হয়।

নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা অমিত শাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। একটি বিবাদাত্মক আইন উল্লেখ করে দেশের জনসমাজে মেরুকরণ করা সম্ভব হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দলিত ও পশ্চাদপদ জনসমাজের বৃহদংশকে হিন্দু হিসেবে অভিহিত করে এবং তাদের ক্রমাগত উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। উত্তেজিত করে নির্বাচনগুলিতে বিশেষ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এ এক সামাজিক প্রযুক্তি। বিরোধী দলগুলিকে হিন্দু-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সংখ্যালঘুদের মনে ভীতির সঞ্চার করে নির্বাচনী সাফল্য নিশ্চিত করছে বিজেপি। একদিকে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দরিদ্র দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর অকথ্য নির্যাতন সংগঠিত করছে হিন্দুত্ববাদী নানা সংস্থার দুষ্কৃতীরা। পশ্চাদপদ অংশের নারীদের নির্বিচারে ধর্ষণ করা হচ্ছে। বহুক্ষেত্রে ধর্ষিতাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। প্রমাণ লোপাট করে দুষ্কৃতীদের আড়াল করার সমস্ত আয়োজন চলছে। আর অন্যদিকে এইসব দলিত বা পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক মানুষকে মগজ ধোলাই করে মুসলিম ও খ্রিস্টান বিরোধী করে তোলা হচ্ছে। এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর এস এস-এর মতো ফ্যাসিস্ত সংগঠনের উদ্যোগে।

সকলেরই মনে থাকা উচিত যে, ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনে বিরুদ্ধে ভারতের নানা প্রান্তে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল। হাজার হাজার নারী পুরুষ সেই প্রতিবাদে সামিল হন। দিল্লির শাহীনবাগ বা জাফরাবাদ অঞ্চলে মুসলিম মহিলারা একাদিক্রমে বহুদিন ধর্না প্রদর্শন করেছিলেন। পথ অবরোধ করেই এই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন মানুষ। উত্তর পূর্ব দিল্লির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসবাসকারী বহুসংখ্যক মানুষ এই প্রতিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সিলমপুর- জাফরাবাদ-মৌজপুর অঞ্চলগুলিতে বহুসংখ্যক মুসলিমের বসবাস হলেও অতীতে কখনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী কোন ঘটনা সেভাবে ঘটেনি। দাঙ্গা হবার কোনো প্রশ্নই নেই।

এরপর ৬ পাতায়

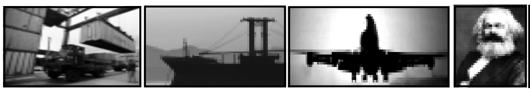

দেশে বিদেশে

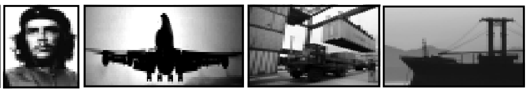

কৌতুকের বিষয় নয়

ইংরেজি ভাষায় কৌতুক ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার লেখক হিসাবে গত শতাব্দীতে পি জি ওডহাউস এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি এলগার পরিষদ মামলায় অভিযুক্ত বন্দী মানবাধিকার কর্মী গৌতম নওলাখা মুম্বাইয়ের উচ্চ আদালতে তালোজা জেল থেকে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার ছাড়াও একটি কৌতুককর অভিযোগ করেছেন। গৌতম নওলাখার অভিযোগ তালোজা জেল কর্তৃপক্ষ ওডহাউস লিখিত ব্যঙ্গাত্মক রচনা সম্বলিত একটি বই নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এই বইটি পড়ার সুযোগ থেকে বন্দী গৌতম নওলাখাকে বঞ্চিত করেছে। নিঃসন্দেহে ওডহাউসের ব্যঙ্গাত্মক রচনায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাটা নওলাখার কাছে বেদনাদায়ক ঘটনা হলেও জেল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের মধ্যে যথেষ্ট কৌতুকের উপাদানও রয়েছে। এমন মন্তব্যই করেছে মুম্বাইয়ের উচ্চ আদালত। পাশাপাশি বন্দী মানবাধিকার কর্মী গৌতম নওলাখার প্রতি বিবিধ দুর্ব্যবহারের জন্য তীব্র সমালোচনাও করেছে উচ্চ আদালত।

ইতিপূর্বে এই একই মামলায় অভিযুক্ত বন্দী Parkinson's Disease এর রোগী স্ট্যান স্বামীকে জল বা চা পান করতে দেবার জন্য সহযোগিতা করতেও অস্বীকার করেছিল জেল কর্তৃপক্ষ। জেল কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না স্ট্যান স্বামীর এক গ্লাস জল পর্যন্ত তুলে ধরার ক্ষমতা ছিল না। বিচারাধীন অভিযুক্ত স্ট্যান স্বামী জেলখানাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বাধীন ভারতের জেল কর্তৃপক্ষের নির্মম আচরণ এমন পর্যায়ে আজ পৌঁছেছে, ঐ একই সময়ে একটি চশমার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন সত্ত্বেও নওলাখাকে তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

পি জি ওডহাউসের রচনাগুলি সম্বন্ধে যাঁরা অবহিত, তাঁদের কাছে ওডহাউসের রচনা নিরাপত্তার কারণে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত কৌতুককর হলেও, বিষয়টি কিন্তু আদৌ কৌতুককর নয়, নির্মমতার উদাহরণমাত্র। আসলে জেল কর্তৃপক্ষের বা প্রশাসনের অজ্ঞতা এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছে তারা বুঝতেই পারেন না, এমন সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের কাছে কৌতুকের বিষয়ও হতে পারে।

তাছাড়া কোন অধিকারে কর্তৃপক্ষ একজন বন্দী বয়স্ক নাগরিককে পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকরা এমন প্রশ্ন করতেই পারেন।

প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক বন্দীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে (ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিলে) আজকের স্বাধীন ভারতের জেল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

প্রসঙ্গ : AFSPA

(Armed Forces Special Powers Act)

ইম্ফলে নতুন রাজ্য সরকার গঠনের পর, আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ডে আংশিকভাবে AFSPA প্রত্যাহার করা হয়েছে। অসামরিক প্রশাসনের উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র নিধনকারী কুখ্যাত AFSPA প্রত্যাহারের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলছিল। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনী প্রচারেও মণিপুর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আওয়াজ উঠেছিল। দীর্ঘকাল দিল্লীতে একের পর এক সরকার এসেছে। তথাকথিত নিরাপত্তার কারণে AFSPA বহাল রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। বিগত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রে আসীন সরকারগুলি সমগ্র উত্তর পূর্ব অঞ্চলে AFSPA কে ব্যবহার করে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সমগ্র অঞ্চলে জঙ্গি আন্দোলনের প্রসার বন্ধ করা যায় নি। প্রসঙ্গত অবিভক্ত নাগা জঙ্গি আন্দোলন দমন করার জন্য ১৯৫৫ সালের Assam Disturbed Areas Act ১৯৪২ সালের ঔপনিবেশিক আমলের অর্ডিন্যান্সের এক বিশেষ নির্দেশনামা অনুযায়ী চালু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলের এই অর্ডিন্যান্সের চরিত্র বজায় রেখেই ১৯৫৮ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জমানায় পার্লামেন্টে AFSPA অনুমোদিত হওয়ার সময় একমাত্র সাংসদ বিহারের উপজাতি এক নেতা এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সংসদে সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রথমে মণিপুরের নাগা অধ্যুষিত উখরুল জেলাকে উপদ্রুত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয়।

এই জেলাতে AFSPA -র প্রয়োগ শুরু হলেও ক্রমশ অন্যান্য নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়। ১৯৮১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সমগ্র মণিপুরকেই উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছিল।

AFSPA-র নানা ধারা উপধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এককথায় বলা যেতে পারে AFSPA-কে বস্তুত সামরিক আইন বা মার্শাল ল' -র সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে, যে আইন সেনাবাহিনী এবং অসামরিক জনগণের মধ্যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে, শিল্প সংস্থা এবং সংস্থার কর্মীদের মধ্যে, নাগরিক সমাজ এবং সরকারের মধ্যে এমনকি প্রতিবেশি দেশগুলির সঙ্গেও বৈরীমূলক ও অস্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি করেছে।

১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত সংগঠনগুলি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইনটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে।

মণিপুর থেকে AFSPA প্রত্যাহারের দাবিতে মানবাধিকার রক্ষা কর্মী ইরম শর্মিলা-র কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আইন প্রত্যাহারের জন্য ইরম শর্মিলা দীর্ঘ ১৬ বছর অনশন করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। থাঙ্গাম মনোরমাকে ধর্ষণ ও খুনের পর মণিপুরের মহিলা সমাজের ইম্ফলে আসাম রাইফেলসের সদর দপ্তরের সামনে উলঙ্গ অবস্থার প্রতিবাদ আন্দোলনের কথাও সহজে ভোলা যায় না। ইম্ফলের মহিলা সমাজের এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক জগতেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

আপাতত আংশিক ভাবে AFSPA প্রত্যাহৃত হলেও নাগাল্যান্ডের ৭৫ শতাংশ অঞ্চলে, মণিপুরের সব পাহাড়ী জেলাগুলিতে, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডের সীমান্তবর্তী আসাম প্রদেশের জেলাগুলিতে এই আইন প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। জনগণের দাবি, এই অঞ্চলগুলি থেকেও AFSPA প্রত্যাহার করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এমন অঘটন ঘটবে কী?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত ছয় দশক সময়কালে জঙ্গি আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে AFSPA র প্রয়োগ শুরু হলেও বস্তুত এই ঘোষিত লক্ষ্যের পরিধির বাইরেও বহু ক্ষেত্রে নির্বিচারে AFSPA র প্রয়োগ করে সন্ত্রাস দমনের নামে সরকার বা প্রশাসনই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। বাস্তব সত্য, একাধিক বেসরকারি এবং সরকারি সংস্থা AFSPA ছাড়াও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে এসেছে। উপদ্রুত অঞ্চলে AFSPA প্রয়োগের নামে AFSPA প্রচ্ছন্ন সমর্থন বিনা এমন অসংখ্য দুষ্কর্মগুলি ঘটানো সম্ভব হত না।

চিনের বিদেশমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফর

চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই (Wang Yi) ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ভারত সফরে এসেছিলেন। ইউক্রেন-রাশিয়ার সংঘাত ঘিরে আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত অস্থির সময়ে চিনের বিদেশমন্ত্রীর এই ভারত সফরে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটবে, এমন আশা অবশ্যই সংগত নয়। ভারত চিন সীমান্তে এক দশকেরও বেশি সময়ের শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখতে চুক্তি অগ্রাহ্য করে নিয়ন্ত্রণ রেখা ডিঙিয়ে ২০২০ সালে পূর্ব লাদাখে চিনা সৈন্য পাঠানোর পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি শুরু হয় এবং বর্তমানে এই সম্পর্ক প্রায় তলানিতে এসে পৌঁছেছে। চিনের বিদেশমন্ত্রী ভারত সফরে এসেছেন, ভাল কথা। কিন্তু লাদাখে ভারতের সীমানার অভ্যন্তরে চিনা সৈন্য মোতায়েন থাকলে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা অজিত দোভাল স্পষ্ট জানিয়েছেন লাদাখ সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দিয়েই অন্য সব বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তব পরিস্থিতিকে স্বীকৃতি দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

প্রসঙ্গত চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই পাকিস্তান ঘুরেই ভারতে এসেছিলেন, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানকে সমর্থন এবং আফগানিস্তানের Belt and Road Initiative-এ যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও চিনের বিদেশ মন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে চিনের মন্তব্যকে ভারত ভাল চোখে দেখতে পারে না। চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও বিষয়ে নাকি ভারত কোনও মন্তব্য করা থেকে সর্বদা বিরত থেকেছে। অবশ্য বাস্তব ঘটনা অন্য প্রকার।

বর্তমানের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আগামী জুন মাসে চিনে BRICKS শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের যোগদানের বিষয়টিকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই চিনের বিদেশমন্ত্রী ভারত সফরে এসেছিলেন। সংকটকালীন মুহূর্তে এই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিলের নেতৃবৃন্দ মিলিত হতে পারলে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিজয় হিসাবেই দেখবে পুতিন এবং জিন পিং জোট।

BRICKS সম্মেলনে যোগদানের আগে ভারত অবশ্য পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিকে বিবেচনা করবে এবং BRICKS সম্মেলনে উপস্থিত হলে লাভ ক্ষতির দিকটাও বিচার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

লঙ্কাকাণ্ড

শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক দুর্যোগ রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। ৩ এপ্রিল রবিবার মাহিন্দা রাজাপক্ষের মন্ত্রীসভা সদলবলে পদত্যাগ করেছে। অর্থনৈতিক ব্যর্থতার দায়ভার স্বীকার করে গভর্নরও পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন। প্রতিবাদী জনগণ ৩১ মার্চ বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ঘেরাও করে গোটাবায়া রাজাপক্ষের পদত্যাগ দাবি তোলায় পরিস্থিতি ঘোরালো হয়। রাজধানীর রাস্তাঘাট “GOTA GO HOME' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাজধানীর স্বাভাবিক কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে পড়ে। প্রশাসন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, শহরে কারফিউ জারি করে। সরকারের সদস্য রাজাপক্ষে পরিবারের চার ভাই গোটাবায়া, মাহিন্দা, চামাল এবং বেসিলের বিরুদ্ধে কলম্বো এবং শ্রীলংকায় গণবিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষে প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে বিরোধীদের যোগদানের জন্য আবেদন জানান। রাজপক্ষেদের তৈরি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের দায়ভার গ্রহণে অস্বীকার করার জন্য বিরোধীপক্ষ প্রেসিডেন্টের আবেদন অগ্রাহ্য করেছে।

কলম্বোর সংকট এবং অর্থনীতি প্রায় অচলাবস্থার জন্য পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য অদূরদর্শী বেপরোয়া ঋণ গ্রহণ, সার আমদানিতে নানা বিধিনিষেধের পাঁচিল গড়ে তোলা, ২০১৯ সালে ইস্টারে বোমাবর্ষণের অপ্রত্যাশিত ঘটনা, করোনা অতিমারি এ সবই শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। খাদ্য সংকট, জ্বালানির অভাব, বিদ্যুতের অভাব পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলেছে। ভারত থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি আমদানির ব্যবস্থা করলেও গণবিক্ষোভের আগুনকে সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া সম্ভব ছিল। ঋণ পাওয়ার কোনও অসুবিধা ছিল না। অপদার্থ মন্ত্রীসভা কিছুই ঠিকঠাক করতে পারেনি। সংবেদনশীলতার সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য যা করনীয়, তা না করে সরকার উল্টো পথে হেঁটেছে। জরুরি অবস্থা জারি করে, নাগরিকদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে গণবিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। অবশ্য এমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কায় কোনও অভিনব ঘটনা নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতায় দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ বা বিকেন্দ্রীকরণে অস্বীকৃতির ফলে শ্রীলঙ্কার নাগরিকরা গৃহযুদ্ধে তিন দশকেরও বেশি সময় ব্যস্ত ছিলেন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শ্রীলঙ্কায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সঠিক চলার পথ নির্ণয় করতে পারবে এমন প্রত্যাশা হয়তো ছিল। মাহিন্দা রাজাপক্ষে স্বয়ং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে পরিচিত এবং তৃণমূলস্তরে রাজনীতি করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর এমন ব্যর্থতা প্রত্যাশিত ছিল না।

বর্তমানে এই অভূতপূর্ব সংকটকালে দেশের কাছে ডলারের সঞ্চয় নেই, অর্থের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ নেই। মুদ্রার ভয়ংকর অবমূল্যায়ন। চক্রবৃদ্ধি হারে মুদ্রাস্ফীতি, দৈনিক ১৩ ঘণ্টা লোডশেডিং, ওষুধ, দুধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে শ্রীলঙ্কার মানুষ এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে।

গোটাবায়া রাজাপক্ষে মাত্র অল্প কিছুদিন আগেই (২০১৯) জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়েই ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় তাঁর সব জনপ্রিয়তা এখন কর্পূরের মতোই উবে গিয়েছে।

সংকটকালে ভারত সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়াবে এমন আশা করা যেতে পারে।

অবিলম্বে শ্রীলঙ্কার সমস্যার সমাধান না হলে শ্রীলঙ্কা ব্যর্থ রাষ্ট্রের তকমা পেতে পারে, এমন আশঙ্কাই করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এরাজ্যে ন্যক্কারজনক নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ কী পরিকল্পিত?

ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।"—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী" উপাখ্যান কাব্যের বিখ্যাত এই চরণটি বারবার মনে উদয় হচ্ছে, আর ভাবনা হচ্ছে, না চাইলেও রক্ষা হচ্ছে কোথায়? চারিদিকে যে সমস্ত কান্ড কারখানা ঘটে চলেছে তাতে স্বাধীনতা বলে কিছু আছে, সেটা নিয়েই সন্দেহ দানা বাঁধছে। জোর যার, মুলুক তার। আজকের দিনেও মাৎস্যন্যায় বিরাজমান, অর্থাৎ দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার। এই সবলতা নানাভাবে অর্জিত হয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, গোষ্ঠীবদ্ধ। বর্তমানে শাসক রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে নানাবিধ কুকর্মের সাথে যুক্ত করার জঘন্য প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেটা সেই রাজনৈতিক দলও মদত দিচ্ছে। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের বদলে আজ যেন তা ভূলুণ্ঠিত। মনে পড়ছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি কবিতার অংশ, যেখানে উনি বলছেন, "হায় কোথা সেইদিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ, এ যে কাল পড়েছে বিষম। সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই, মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম।" এত যুগ পরেও কথাগুলো মনে হয় বর্তমানের সাথে বিশেষ মানানসই।

দিনের পর দিন একশ্রেণির নিম্নমানের মানসিক বিকৃতির অত্যাচারী স্বার্থান্বেষী পুরুষ যে লোলুপ দৃষ্টিতে নারীদের উপর জঘন্য ধরনের নারকীয় অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে সমাজের সর্বস্তরে আতঙ্ক গ্রাস করছে।

সমাজ আরও কলুষিত করে বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন প্রশাসন চালিকাশক্তির মদতে সেই জঘন্য কাজে সহায়তা করে। হাথরস থেকে হাঁসখালির ঘটনাগুলি সমাজে কম্পন সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, নারী নির্যাতন বলতে, নারীদের উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, কিংবা অর্থনৈতিক, যেকোন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়। আরও সহজ ভাবে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নারীরা যখন অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক বঞ্চনার সম্মুখীন হয় এবং শারীরিক, যৌন ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে পরিস্থিতিকে নারী নির্যাতন বলে।

যেকোন অধিকার খর্ব করা বা হরণ করা কিংবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা নারী নির্যাতনের অঙ্গ। মানব সমাজে অপরাধ নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই অপরাধের সংখ্যা আতঙ্কজনক ভাবে বেড়েই চলেছে। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ ইদানীং মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কঠোর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এর থেকে মুক্তি পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে অহরহ ঘটে চলেছে নানা বয়সের নারী ও শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন। সব নির্যাতনের খবর সব সময় প্রকাশ্যে আসে না। সব খবরের তীব্রতাও নানাবিধ কারণে সমান হয় না। কিন্তু যতটুকু প্রকাশ্যে আসে তা ভাবতেই শিহরণ জাগে। সমসাময়িক সময়ে অন্যান্য প্রদেশের ঘটনা দূরে সরিয়ে রেখেও শুধুমাত্র এই পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনার বিষয় আলোচনা করলেই এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি সম্ভব। এবং এরা এতটাই অমানবিক ও ভয়ানক নিম্নমানের জীব যে, বয়সের বা সম্পর্কের বাঁধও এখানে ভেঙ্গে যায়। বলা যায়, বয়স কিংবা সম্পর্ক কোন বিচার্য বিষয়ই নয়। এককথায় কুরুচিপূর্ণ কামোন্মত্ত নিকৃষ্টতম জীবের কাছে এমনকি সম্পর্ক বা বয়সও হার মানছে।

অন্য ঘটনাসমূহ শুরু করার আগে আরেকটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যাক। হরিয়ানা থেকে টেনে করে এক যুবককে নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে পুলিশ পলাশিপাড়া থেকে নিখোঁজ "অপহৃত" নাবালিকা সহ হাওড়ায় নিয়ে আসার সময় তারা উধাও হয়ে যায়। সেখানে তাদের পাহারায় পাঁচ পাঁচ জন পুলিশ ছিল বলে খবর। এর থেকে পুলিশ কর্মীদের একাংশের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়।

পড়াশোনার জন্য নাবালিকা মেয়েকে কলেজ শিক্ষকের কাছে রেখে নিশ্চিন্তে ছিলেন বাবা। যোল বৎসরের ওই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে পঞ্চাশোর্ধ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপে বছর চল্লিশের এক মহিলাকে গণধর্ষণের পর পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, রাতে শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য বাইরে বেরোলে চারজন মুখ চেপে ধরে তাঁকে ধর্ষণ করে। মহিলার স্বামী কাজের জন্য বাড়ি থেকে দূরে থাকে। চারজনের মধ্যে মহিলার ভাসুরও ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনায় আরও অভিযোগ, নির্যাতিতা কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন হাসপাতালের এক নার্স তার সাথে দুর্বব্যবহার করে ও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। প্রশ্ন জাগে, একজন নার্স এই ঔদ্ধত্য দেখাবার সাহস কোথা থেকে অর্জন করে? নিঃসন্দেহে এর সাথে যুক্ত আছে অন্য পরাক্রমশালীরা।

উত্তর দিনাজপুরের আট বছরের শিশুকন্যাকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে প্রতিবেশী এক যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। উত্তর দিনাজপুরের অন্য একটি ঘটনায় পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার দূরসম্পর্কের কাকার বিরুদ্ধে।

বাগদা থানা এলাকায় দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে। বছর খানেক আগেও ওই নাবালিকাকে নিয়ে অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছিল বলে জানা গেছে। বীরভূমের গ্রামে এক আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। চরম লজ্জার বিষয় যে, এই ঘটনায় নাবালিকার বাবাও অভিযুক্ত। দাসপুরের খাজাপুরে চাকরি দেওয়ার নাম করে এক যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

উত্তর চব্বিশ পরগনার মিনাখাঁয় ঘুমের ওষুধ খাইয়ে এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে। মেয়েটি নবম শ্রেণির ছাত্রী। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্য একটি ঘটনায়, পনের বছরের কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়। অভিযোগ ঘটনায় জড়িতরা গ্রামের ছেলে এবং নানা দুষ্কর্মের সাথে যুক্ত।

তেহট্ট মহকুমায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করার অভিযোগ করে যে অভিযোগকারী, সে এবং অভিযুক্ত দু'জনেই বিবাহিত। বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। অভিযুক্ত যুবক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এবং একাধিকবার তরুণীর সঙ্গে সহবাস হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু একাধিকবার সহবাসের পর বিয়ের কথা বললে যুবক বিয়ে করতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পলাশিপাড়ার বাসিন্দা সত্তর বছরের এক বৃদ্ধাকে এক যুবক শ্লীলতাহানি করেছে বলে অভিযোগ।

বলাগড়ে এক পনের বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অভিযোগ তার দাদুর বিরুদ্ধে। পশ্চিম মেদিনীপুরে মানসিক প্রতিবন্ধী এক যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত শাসকদলের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও গভীর প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ পঞ্চায়েতের প্রধানের উপস্থিতিতে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা হয়েছিল। কোনো ধরনের মামলা রুজু করা যায়নি। পরে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে।

অশোকনগরে তের বছরের এক কিশোরীকে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে পড়শি এক বৃদ্ধ ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বৃদ্ধ কিশোরীকে আগে ধর্ষণ করলেও ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল বলে অভিযোগ। পরে কিশোরী অন্তঃসত্বা হয়ে পড়ায় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

বর্ধমানে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে।

জলপাইগুড়ি জেলায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের এক নেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে আড়াল করার জন্য তৃণমূলের কেউ কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং হুমকি দেওয়ার পর নাবালিকা গায়ে আগুন দেয় বলে অভিযোগ।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগর থানা এলাকায় এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এক জওয়ান। সে বিবাহিত। যদিও ওই জওয়ানের সঙ্গে সাত বৎসরের সম্পর্ক এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বহুবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কার্শিয়াঙে চলন্ত গাড়িতে এক মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে একজন। বাধা দিলে তাকে মারধর করা হয়। মহিলা গাড়ি থেকে লাফিয়ে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পেলেও গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বর্তমানে যে ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে সর্বাধিক দাগ কেটেছে বা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তা হলো, নদীয়া জেলার হাঁসখালির ঘটনা।

যতটুকু খবর সংগ্রহ করা গেছে, চোদ্দো বছর বয়সী মেয়েটি অভিযুক্তর পূর্ব পরিচিত। একই গ্রামের বাসিন্দা। মেয়েটির বাবা অত্যন্ত গরিব এক দিনমজুর। ছেলেটির বাবা শাসক তৃণমূল দলের পঞ্চায়েতের প্রভাবশালী সদস্য। ঘটনার দিন ছেলেটির জন্মদিনের পার্টি ছিল এবং সেখানে মেয়েটির নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানেই গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অন্য একজন তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সময় কোন সরকারী হাসপাতালে না নিয়ে স্থানীয় কোন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নেওয়ার কথা বলে যায়, যার মধ্যে হুমকি মিশ্রিত ছিল। মেয়েটির বাড়ির লোক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা সেই অর্থে না করে গ্রামীণ হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মেয়েটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শাসকদলের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে তারাই তাড়াতাড়ি প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহটির দখল নেয় এবং কোনরকম পোস্টমর্টেমই হয় না। অতি আশ্চর্যজনকভাবে ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই গ্রামের শ্মশানে তাকে দাহ করে দেওয়া হয়।

যে শ্মশানে দাহ করা হয় সেটা কোনও অনুমোদন প্রাপ্ত শ্মশানই নয়। রাজ্যের বেশ কিছু জায়গাতেই এমন ব্যবস্থা চালু আছে। বহু কাল আগে থেকেই এমনভাবে দেহ সৎকারের ব্যবস্থা হয়ে আসছে। পরে পারিবারিক কাজে ডেথ সার্টিফিকেট দরকার হলে স্থানীয় চিকিৎসকের শংসাপত্র দেখিয়ে পঞ্চায়েতের থেকে সেই শংসাপত্র জোগাড় করা হয়।

এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে। শংসাপত্র ছাড়া মৃতদেহ দাহ করার সুযোগ না থাকলে এই ধরনের ঘটনা সহজেই ঘটানো সম্ভব হত না। কিন্তু এই ব্যবস্থা কবে দূর হবে তার আগে কিছু দানবের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কত মায়ের কোল খালি হবে সেটা গভীর চিন্তার বিষয়।

কিন্তু রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এমন এক নৃশংস হত্যা ও প্রমাণ লোপাটের কোন ঘটনাকে "ছোট ঘটনা" হিসাবে চিহ্নিত করেন তখন সীমাহীন বিস্ময় হয়। তিনি বলেছেন, "মেয়েটির লাভ অ্যাফেয়ার্স ছিল।" কিন্তু তা থাকলেও কাউকে শারীরিক নির্যাতন করার বা তাকে হত্যা করা কিংবা ঘটনার প্রমাণ লোপাটের অধিকার আছে কিনা সে বিষয়ে অতি সঙ্গত প্রশ্ন জাগে। ঘৃণা বোধ হয় এধরনের জঘন্য উক্তিতে।

এমন এক নির্মম অঘটনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিরোধী কিংবা শাসকদল সভা, সমাবেশ, মিছিলের মাধ্যমে প্রচার সহ যে যার বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। ওখানকার মানুষ ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রকৃত অপরাধীদের কঠোর শাস্তির পাশাপাশি এই প্রশ্নও তুলেছে যে, হাথরস কিংবা উন্নাওয়ে একই রকম বীভৎস ঘটনায় যে বিজেপি সরকার অভিযুক্ত, তাদের নারীদের সম্মান নিয়ে কতখানি সদিচ্ছা বর্তমান! তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে এই ন্যক্কারজনক সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কেও বিচিত্র মিল। আর এস এসের দর্শনে অবশ্য নারীর কোনও গুরুত্ব নেই। এমনকি, নারীকে শুধুমাত্র ভোগের জন্য ব্যবহারের বিধান দেওয়া হয়। পুরুষের ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে চলাই নারীর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত বলে মনুস্মৃতির বিধানকেই তারা বাস্তবে প্রয়োগ করতে উদগ্রীব। সুতীব্র সংশয়, এ রাজ্যের শাসক দলও মুখে যাই বলুক, বাস্তব ক্ষেত্রে নাগপুরের নির্দেশ মেনেই চলে।

তাছাড়া এমন সব কুৎসিত আক্রমণ সংগঠিত করে দরিদ্র পরিবারগুলিকে সন্ত্রস্ত করার পরিকল্পনা শাসক দল এখন থেকেই করছে কিনা তা, সন্দেহাতীত নয়।

এই সমস্ত অঘটনে মদত দেওয়া হচ্ছে যাতে করে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই এলাকার জনসাধারণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এবং পুলিশ কিছুটা হলেও ধীরে ও থমকে গিয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং সি বি আই বিষয়সমূহ নিয়ে যে তদন্ত করছে, এর মধ্যেও রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি-র বাইনারি কাজ করছে বলে অনেকের বিশ্বাস। একটি নির্বাচনের ফল কিছুটা হলেও পরবর্তীতে প্রতিফলন ঘটায় বলে অনেক আগে থেকেই এসবের পটভূমি তৈরির চেষ্টা চলছে আগামী নির্বাচনগুলির দিকে তাকিয়ে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সুস্থ চেতনা সম্পন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া হয়তো সম্ভব। এরাজ্যের সমাজমানস ২০১১ সাল থেকেই ধ্বংসের পথে। এখন তা পূর্ণতা পাচ্ছে। এই রাজ্যে তৃণমূলী শাসন দেশের সংবিধান মেনে সাধারণ মানুষের জীবনে ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ। অতীব ন্যক্কারজনক তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। পুলিশ প্রশাসন দলদাসদের দ্বারা পরিচালিত। এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে, ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে আবার বিরোধীশূন্য করার ছক এখন থেকেই চলছে। এর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপ্ত গণআন্দোলন ও চেতনার বিকাশই হয়তো বাঁচার পথ।

পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই প্রগতির পথে চলতে হবে

পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র ভারত এক কঠিন মানবিক সংকটের তীব্র দহনে ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। নানা অনতিক্রম্য অস্বাভাবিক সমস্যা মানুষের জীবন, দৈনন্দিন যাপনকে ঘোর অন্ধকারে বিপর্যস্ত করে চলেছে। মানুষ হাহাকার করছেন এমন এক অন্ধকারময় সর্বব্যাপী আতঙ্কে। পথ হাতড়ানো সাধারণ স্বল্পবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে অনেক সময়ই সবকিছু বৃথা বলে মনে হচ্ছে। গুমরে মরছে বিপুল সংখ্যক মানুষ। তারা তাকিয়ে আছে দেশের মধ্যে যারা উন্নতবোধ ও চেতনা সম্বল করে এই সমস্যাদীর্ণ অবস্থার সুষ্ঠু পরিবর্তন চাইছেন তাঁদের দিকে। তাঁরা পথে হয়তো সবাই বেরোচ্ছেন না। অনেকেই হয়তো চেতনাঋদ্ধ হয়েও দ্বিধান্বিত অথবা ক্রমাগত ভীতি প্রদর্শনের শাসক প্ররোচিত কার্যক্রমে সাহস হারাচ্ছেন।

এটা অবশ্যই স্বাভাবিক যে, বর্তমান বা চলমান পরিস্থিতি দেশের অতি সম্পন্ন অংশের কতিপয় বা সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের কল্যাণে, আরও সম্পদ সংগ্রহকে সুচারুরূপে সম্ভব করতেই উৎসুক। তাদের দায়বদ্ধতা সমগ্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতি নয়। তারা সমস্ত অর্থেই সম্পদের অধিকারী সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা করতে উদ্‌গ্রীব। আর এই কুকর্মকে বাস্তবায়িত করতে এই অংশের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্রমাগত আবেদন জানাচ্ছেন সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কোণঠাসা করতে। সেই সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করতে ধর্মবিশ্বাসই একমাত্র পরিমাপক। সংখ্যালঘু অংশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে গুরুত্বহীন করে ফেলে শুধুই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকেই বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার অপকৌশল চলছে।

এই চূড়ান্ত অপকৌশলকে সম্ভব করতে বহু অতীতকালের কিছু কিছু কল্পকাহিনীকেই ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে। ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে অহরহ। মানবেতিহাসের চর্চা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইতিহাস স্মরণে মানুষ ভুলের ফাঁদ থেকে বাঁচে। একই ভুল বারংবার করে না। যথার্থ ইতিহাস রচনায় এই কর্তব্যটি বিশেষ জরুরি এবং অবশ্যকরণীয়। অতীতকালে পড়ে থাকার জন্য নয়, অতীতের অভিজ্ঞতা সম্যক উপলব্ধি করে অনাগত ভবিষ্যত রচনায় তা এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই হাতিয়ারকে ব্যবহার করেই সম্মুখপানে চলেছেন পৃথিবীর নানা দেশের প্রগতিপন্থীরা।

এইসব চেতনাসম্পন্ন মানুষরা যে সর্বত্রই সফল হয়েছেন তাঁদের স্বপ্নপূরণে, এমন নয়। অনেক সময় আবার প্রভূত ঘাম ও রক্তে অর্জিত সুফল অন্যবিধ ভ্রান্ততার কোপে পড়ে হারিয়ে গেছে। সেই সব পরিবর্তিত দেশের অভ্যন্তরে অন্ধকারময়তা বাসা বেঁধেছে। প্রকৃতি তো শূন্যতা আদৌ সমর্থন করে না। ভালোর সঙ্গে চলমান দ্বন্দ্বে চূড়ান্তভাবে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। বহু পরিশ্রম অধ্যবসায় এবং স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে যে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হলো তা, ক্রমাগত যত্ন ও চর্চার অভাবে হারিয়ে যায়। পুরোনো ও পরিত্যক্ত সামাজিক বোধগুলি পুনর্বার মানবজীবনকে আচ্ছন্ন করে এবং বিপরীত পথে চলতে প্রশ্রয় দেয়।

এসব বিবিধ ঘটনাক্রমের অভিজ্ঞতা অবশ্যই গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বিজ্ঞানসম্মত পথেই সেই বিশ্লেষণ নির্মোহভাবে করা দরকার। ধর্মীয় কিংবা অন্যবিধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সঠিকভাবে এমন কাজ করা একেবারেই সম্ভব নয়। যারা মানবসভ্যতার অগ্রগমনকে রুদ্ধ করতে চায়, তারা ভ্রান্ত এবং উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা হাজির করতে সদা তৎপর। প্রগতিপন্থীরা যদি ঝিমিয়ে থাকে বা ঘুমিয়ে থাকে তাহলে, বিপরীত পথের কুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাই সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে যায়। তা থেকে মানুষকে বের করে সঠিকপথে পরিচালিত করা অতীব কঠিন কাজ। সে কারণেই সাধারণের কাছে তাদের বোধগম্য ভাষায় যথাযথ ব্যাখ্যা নিয়মিত উপস্থাপিত করা প্রগতির সাধকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

এই কর্তব্য পালন করতে গেলে প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত মানুষ স্বেচ্ছায় প্রগতি পথে চলছেন বা পথ চলতে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে দৃকপাত করতেই হবে। প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে যে, কিছুকাল নিবিড় অনুশীলনের পরে তাঁরা আর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের ব্যবহারিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত নন। আর্থসামাজিক পরিস্থিতির দৈনন্দিন ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা যেমন অতি প্রয়োজনীয় ঠিক তেমনই, সেইসব তথ্যগুলি সহজ সরলভাবে বৃহত্তর জনসমাজে পৌঁছে বস্তুনিষ্ঠ চেতনার ব্যাপক প্রচারও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সমস্ত প্রগতি পথিক অবদমিত শ্রেণিগুলির বহু মানুষের জীবনচর্যা থেকে যেমন শিক্ষা নেন তেমনি, তাঁরা সাধারণ অচেতন অর্ধচেতন মানুষের শিক্ষকও হয়ে পড়েন। একদিন দুদিনে তা, সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল যাবৎ নিরলস পরিশ্রম ও লক্ষ্য স্থির রেখে পথ চলতে হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কাজ করে যেতে পারলেই সাধারণ মানুষ প্রগতিপথ সম্পর্কে, পরিবর্তিত সমাজের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পরিচিত হন। মানুষ যথাযথ পথে চলতে থাকেন। সব ক্ষেত্রেই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি যেমন অত্যন্ত জরুরি একইভাবে পরিবর্তনের সংগঠকদের সমাজতান্ত্রিক দর্শন সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় চর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকাও একান্তভাবে জরুরি।

বস্তুবাদী জীবন দর্শন অনুসরণে নিঃসন্দেহ হয়েই প্রত্যয় গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাঁরা পরিবর্তনের পথে বা প্রগতিপথে চলতে উৎসুক হয়ে ওঠেন, তাঁদের মধ্যেও দর্শনবোধ সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করবেন সেই অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠকরাই। এই মুখ্য বিষয়টি উপেক্ষা বা অবহেলা করলে লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বস্তুবাদী দর্শনকে জটিল করে বা যান্ত্রিকভাবে পরিবেশনে লক্ষ্যপূরণ হবে না। জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ভাবনাগুলি জনমানসে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে একাজ করবেন, তাঁদের অবশ্যই যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন। তা না হলে বিপরীত ফলও হতে পারে। সুতরাং সমাজ পরিবর্তনের কারিগরদের ঐকান্তিকভাবে শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে হবে। সেভাবেই জীবনাচরণে অভ্যস্ত হতে হবে।

'মানুষের জন্য অনেক কাজ করছি', কথাটির কোনো অর্থ নেই। মানুষকে দেনা-পাওনার মধ্যে সম্পর্কিত করলে কিছুকাল সেই মানুষেরা সংগঠককে অনুসরণ করবে কিন্তু, দীর্ঘকাল তা হবে না। অথচ সমাজ দর্শন, সমাজের ওপর শোষণ নিপীড়নের কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ মানুষের কাছে যত্নের সঙ্গে নিয়মিত পৌঁছে দিতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব।

পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির পূরণ অসম্ভব। প্রগতিপন্থীদের পক্ষে মানুষের আর্থ সামাজিক চাহিদাগুলি পূরণ করাও এক অসম্ভব কল্পনা। মানুষকে সংগ্রামশীল হিসেবে বিজ্ঞানসম্মত বোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করাই প্রকৃত কাজ। সেই কাজে যত্নশীল না হয়ে কিছু চটকদারি কর্মসূচি নিয়ে চলা অর্থহীন। সমাজে উপকারী ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে বহু ধরনের ঘাত প্রতিঘাতের উদ্ভব মেনে নিয়েই এগোনো উচিৎ। এর কোনো একরৈখিক সরল পথ নেই।

মনে রাখতে হবে, যে সমস্ত প্রগতিপথের কর্মী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন তাঁরা একসময় নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীর কাছে বিশেষ আদরণীয় হয়ে ওঠেন। অনেকেই তাঁদের 'রোল মডেল' বলে ধরে নেন। ভালবাসেন, সম্মান করেন, আত্মীয়জ্ঞান করে মর্যাদা দেন। অনেকে আবার দূর থেকেই সমীহ করেন। যাঁরা তাঁদের কর্মধারার মাধ্যমে মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করেছেন তাঁদের অনেকক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানে জীবন নির্বাহ করতে হয়। অনুশীলন করতে হয় জীবনদর্শন। সৃজনশীল হতে হয় প্রতিনিয়ত।

সমাজতান্ত্রিক দর্শন সম্পর্কে শুধুমাত্র অবহিত হলেই হবে না। সেই বোধ সাধারণভাবে নিপীড়িত মানুষের মধ্যে নিবিড় চর্চার প্রয়োজন। যে সব সংগঠকরা তত্ত্বগতবোধের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না তাঁরা কখনোই সমাজ প্রগতি নিশ্চিত করার পথে চলতে পারেন না। পুরনো বোধ বর্জিত এক সর্বৈব নতুন সমাজ গড়ে তোলার পথ বড়ই বন্ধুর। বহু চড়াই উতরাই অতিক্রম করেই সে পথে চলতে হয়। বামপন্থীরা সাধারণভাবেই সেই পথে চলতে দায়বদ্ধ। এই কাজে চটজলদি কোনো সাফল্য নাও আসতে পারে। বিজ্ঞানবোধ সহ সমস্ত সামাজিক পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হয়। মানুষের জীবনকে কোনো নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলার কর্মকাণ্ড সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

বামপন্থী বা প্রগতিপন্থীদের একান্তভাবে স্বচ্ছজীবনবোধের নিয়মিত চর্চা প্রয়োজন। কোনো ওপর চালাকিপূর্ণ কথাবার্তা বা বক্তৃতা করে এমন কাজ সমাধা করার কোনও সম্ভাবনা নেই। সমাজ পরিবর্তনের এমন কাজে যাঁরা সচেতনভাবে যুক্ত তাঁদের উন্নত গণতান্ত্রিক বোধ থাকা সর্বাপেক্ষা জরুরি। মানুষের ওপর কোনো মতামত জোর করে চাপিয়ে দেবার প্রবণতা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। মানুষকে মর্যাদা দিয়ে মানবিক বোধগুলিকে আরও শক্তিশালী করেই এগোতে হবে। রাতারাতি কিছু হয়ে যাবে না। লক্ষ্য স্থির করে ধৈর্য ধরেই পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলি করে যেতে হবে।

শিক্ষক নেতা কমরেড তীর্থগোপাল মুখার্জি প্রয়াত

রাষ্ট্রপতি-পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক তথা বাঁকুড়া জেলা আর এস পি'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সক্রিয় সংগঠক ও সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা কম. তীর্থগোপাল মুখার্জি (৮৭) গত ৯ এপ্রিল, ২০২২ দুপুর ১২.১৫ মিনিটে বার্ধক্যজনিত রোগভোগের পর বাঁকুড়া সেবা নিকেতন নার্সিংহোমে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণের সংবাদে জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিকাল ৪.৩০ মিনিটে দলের বাঁকুড়া জেলা দপ্তর প্রাঙ্গণে তাঁর মরদেহ পৌঁছানোর অনেক আগে থেকেই দলীয় নেতৃত্ব-সদস্য সহ বামফ্রন্টের সি পি আই এম, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা নেতৃত্ব এবং সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি, জয়েন্ট কাউন্সিল অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনস-এর প্রতিনিধিবৃন্দ অপেক্ষমান ছিলেন। মরদেহে দলীয় রক্তপতাকা দিয়ে প্রয়াত কমরেডকে যথোপযুক্ত সম্মান জানানোর পর উপস্থিত সকলে মাল্যপ্রদান করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পর স্থানীয় লক্ষ্যাতড়া মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

দীর্ঘদিন, প্রায় ষাট বছর দলীয় সদস্য ও নেতৃত্ব হিসাবে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণে শেষ কয়েকবছর সক্রিয়ভাবে দলীয় ক্রিয়াকর্মে জড়িত থাকতে না পারলেও দৈনন্দিন কাজকর্মের খবরাখবর রাখতেন ও অভিভাবক-সুলভ পরামর্শ দিতেন। তাঁর প্রয়াণে বাঁকুড়া জেলা পার্টি ও বিশেষত শিক্ষক সংগঠন এক অভিভাবককে হারাল। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে প্রয়াত কম. মুখার্জির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। জেলাতে পার্টি প্রতিষ্ঠাকালের সংগঠকদের শেষ প্রতিনিধির প্রয়াণে একটি যুগের অবসান হল।

কম. তীর্থগোপাল মুখার্জি লাল সেলাম।
কম. তীর্থগোপাল মুখার্জি অমর রহে॥

সলিল সরকারের দেহাবসান

গত ৭ এপ্রিল খড়দহ-টিটাগড় লোকাল কমিটির সদস্য কম. সলিল সরকারের দেহাবসান হয়েছিল। দীর্ঘ দু'মাস ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই আর এস পি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। খড়দহ টিটাগড়ের প্রাক্তন শ্রমিক নেতা কম. বেণী চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে খড়দহ টিটাগড়ের জুটমিল ও পেপারমিলের শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি টেক্সম্যাকো কারখানার শ্রমিক ছিলেন। ১৯৬২ সালে খড়দহে একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর উপস্থিতির সময়ে রাজ্য আর এস পি'র নেতৃবৃন্দ কম. ননী ভট্টাচার্য, কম. মতীশ রায় স্বর্ণ আইন বিরোধী প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। সেই সময় থেকেই কম. সরকার সক্রিয় দলীয় কর্মীরূপে দলের প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীও একসময় পশ্চিমবঙ্গ নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মৃত্যুর পরে আর জি কর হাসপাতালে তাঁর দেহদান করা হয়। তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী এবং দুই পুত্র ও এক কন্যার প্রতি আমাদের শোকজ্ঞাপনের ভাষা নেই। সহজ সরল জীবনচর্যায় অভ্যস্ত কম. সরকারের মৃত্যুতে এলাকার বামপন্থী কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

এই ধর্ষক উপত্যকা আমার রাজ্য না—রুখে দাঁড়ান

সর্বানী ভট্টাচার্য

১৪ বছরের কিশোরীর দেহটি ভস্মীভূত করে দেওয়া হল। যে মেয়েটা বুঝতেও পারল না কি তাঁর অপরাধ? সে জানতে পারল না কি অপরাধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার নামের সঙ্গে কতগুলি অসংবেদনশীল মন্তব্য জুড়ে দিলেন। এখন ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গুন্ডা তোলাবাজকে মদত দিলেন। এই ঘটনার পর থেকে মনে হচ্ছে মেয়েটি যেন প্রশ্ন করছে ধিকৃত করছে আমাদের। এরাজ্যে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির পারিবারিক উৎসবে একটি মেয়ে নিরাপদ নয়। কেন নিরাপদ নয়? কেন ধর্ষিত হওয়ার পর মেয়েটির জীবনের নিরাপত্তা না দিয়ে তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিল? কেন চাটাই জড়িয়ে মেয়েটিকে নিয়ে গেল তাকে পুড়িয়ে দিতে? তখন কি সে জীবিত ছিল না মৃত? কে নিশ্চিত করল? তাকে যে জ্যান্ত পুড়িয়ে দেওয়া হল না সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য—তার গ্যারান্টি কোথায়? আর ময়না তদন্ত না করে মেয়েটিকে পুড়িয়ে দেওয়া তো সেই সন্দেহেরই উদ্রেক করে। আর একইসঙ্গে মেয়েটির পুরো পরিবারকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়ে তাকে থানায় যেতে বাধা দিল জনপ্রতিনিধির পোষা গুন্ডারা।

আরো আশ্চর্যের যে, যে পুলিশের কাছে সমস্ত খবর থাকে পাঁচদিন পর্যন্ত তার কাছে এই নৃশংস ঘটনার কোনো খবরই এলো না? এও কি বিশ্বাসযোগ্য? এই অপদার্থ পুলিশ প্রশাসনের কাছে রক্তাক্ত শয্যায় যন্ত্রণাবিদ্ধ আতঙ্কিত মেয়েটির ন্যায় বিচারের অথবা চিকিৎসার সুযোগ কোনকিছুই পাবার আশা তো করেইনি, বরঞ্চ ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়েটি আকুলস্বরে তার মাকে বলেছে "মা আমি বোধহয় আর বাঁচব না।" আর অসহায় বাবা-মা ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ভয়ে ও ধর্ষণের কথা জানাজানি হলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বেঁচে থাকার যে যন্ত্রণা—তার ভয়ে আইনি সাহায্য নিতেও সাহস করেননি। বরঞ্চ মেয়েকে যখন চাটাই মুড়ে (জীবিত বা মৃত) নিয়ে গেল গুন্ডাবাহিনী তখন প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেনি। এতকিছুর পরও যন্ত্রণাবিদ্ধ অসহায় বাবা মা যখন শ্মশানে পৌঁছেছেন তখন তাঁর মেয়ে আর পৃথিবীতে নেই, দাহকার্য সমাধা হয়ে গেছে। মাননীয় শাসকের কাছে আমরা প্রশ্ন করতে চাই—আপনি বলেছেন কেন পুলিশকে রিপোর্ট করল না পাঁচদিন ধরে পরিবার? আশা করি আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না, কেন পুলিশের কাছে অসহায় বাবা মা বিচারের দাবি নিয়ে থানার দরজায় পৌঁছতে পারেনি। এর উত্তর আপনার কাছেই আছে।

এ এমনই এক রাজ্য, এমনই এক পৃথিবী যেখানে ধর্ষকের চেয়ে ধর্ষিতা লজ্জিত হয় বেশি। আর সেই ধর্ষকের মুক্তাঞ্চলে ধর্ষিতার মা বাবাকে অন্ধকারে মুখ লুকোতে হয়। এ কোন রাজ্য?

এই ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও এই মেয়েটির মৃত্যুতে ব্যথা পান না, অপমানিত হননা। যে পুরুষশাসিত সমাজের শক্তির শিকার এই মেয়েটা, সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে তো দাঁড়াতেই পারেন না বরঞ্চ উল্টে বলেন "অ্যাফেয়ার ছিল? না, হয়তো প্রেগনেন্ট ছিল"। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা! একটি মেয়ের অ্যাফেয়ার থাকলে তাকে ধর্ষণ করার অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্রের কি আছে? এ কথায় মদত পেয়ে নদীয়া জেলার পুলিশ সুপার তাই বলেন 'মেয়েটি তো নিয়মিত ড্রিংক করত'। হায় সমাজ! হায় রাষ্ট্র! আমাদের শিরদাঁড়া বেয়ে হাড়হিম হয়ে নামে ভয়ের স্রোত। একটা ১৪ বছরের জনমজুরের পরিবারের মেয়ে যাকে প্রশাসন কোনো সুরক্ষা দিতে পারে না, তার মৃত্যু প্রশাসকদের লজ্জিতও করে না। তার কাছ থেকে সান্ত্বনাও পায় না নির্যাতিতার পরিবার বরঞ্চ মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষকদের রক্ষা করতে তৎপর হোন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর এই কি আমাদের প্রাপ্য ছিল? রাজ্য জুড়ে চলছে দুর্বৃত্তদের শাসন। আজ আর লুম্পেনরা সরকারী রাজনৈতিক দলে শুধু আশ্রিত নয়, আজ তারাই রাজনৈতিক দল চালায় প্রশাসনের শীর্ষে বসে।

২০১২ সালে শিশুদের যৌন অত্যাচার ও শোষণ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য 'পকসো আইন ২০১২' পাশ হয়। প্রশাসকদের বক্তব্য শুনে তো মনে হচ্ছে, আমরা মনুসংহিতার যুগে ফিরে যাচ্ছি।

এই প্রশাসকদের যে রাজনৈতিক ক্ষমতার মদমত্ততা তার জোরে তারা বলতেই পারেন মেয়েটির চরিত্র খারাপ ছিল। আর তাই সে ছেলেদের উত্যক্ত বা উত্তেজিত করেছিল। যে রাষ্ট্র একটি নাবালিকাকে সুরক্ষা দিতে পারে না সে কিন্তু তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে! কারণ এই শাসকদলের হুলিগানরাই দলকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করছে, ফলে তারা ধর্ষক হলেও তাদের আড়াল করা প্রশাসনের/মুখ্যমন্ত্রীর ও তাদের আমলাদের দায়িত্ব। এখানে একটি প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই মনে উঁকি দেয় তা হল যে রাজ্যে বা দেশে একটি সরকারি গেস্ট হাউসে বা হোটেলে থাকতে হলে আধার কার্ড লাগে সেখানে একটা দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হল কোনো পরিচয় পত্র ছাড়া! ছেলেটির বাবা শাসকদলের হোমরা-চোমরা তাই কি এই ছাড়?

প্রসঙ্গত এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই তা হল, মথুরা ধর্ষণ মামলা। প্রশাসক এবং আমলা সকলেই এ বিষয়ে অবহিত আছেন। ১৯৭২ সালের ২ মার্চ ভারতের মধ্যে কাস্টোডিয়াল ধর্ষণের একটি ঘটনা। যেখানে এক তরুণী আদিবাসী মেয়েকে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলার দেসাইগঞ্জ থানার ভেতর দুই পুলিশ সদস্য দ্বারা ধর্ষিত হতে হয়। সুপ্রিম কোর্ট আসামীদের বেকসুর খালাস করে দেয় এবং এমন অশালীন মন্তব্য করে যে, সারা দেশ গর্জে উঠেছিল। সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে যে তার শরীরে কোন অত্যাচারের দৃশ্যমান চিহ্ন ছিল না। ফলে জোরপূর্বক ধর্ষণ ঘটেনি এবং ১৪-১৫ বছরের মেয়েটি যৌনতায় অভ্যস্ত ছিল, মেয়েটি পুলিশকে সহবাসে প্ররোচিত করেছিল। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষ গর্জে উঠছিল।

বিশেষত উপেন্দ্র বক্সী, লতিকা সরকার, রঘুনাথ কেলকার, বসুধা ধাগমওয়ার সুপ্রিম কোর্টে একটি চিঠি লেখেন। লতিকা সরকার ১৯৮০ সালে Forum against oppression of Women নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। একই সঙ্গে সারা দেশে নারীরা আন্দোলনে নামেন। সেই প্রতিবাদের ফলেই Criminal Law Ammendment Act (43 no.) সংশোধিত হয়। Indian Evidence Act এ এই মর্মে পরিবর্তন আনা হয়। ১) সম্মতি ব্যতীত সঙ্গম সবসময়ই ধর্ষণের আওতায় পড়বে। এছাড়া ২) সম্মতির প্রশ্নে আক্রান্ত মেয়েটির বিবৃতিই যথেষ্ট, অন্য কোন প্রমাণ দরকার নেই। এছাড়া ধর্ষণের ঘটনায় আঘাত সম্পর্কিত কোন জবাবদিহি করতে বাধ্য নন ধর্ষিতা।

এর প্রায় ২৯ বছর পর নির্ভয়া কাণ্ড ঘটবার পর জাস্টিস ভার্মা কমিশনের রিপোর্টে এই আইনকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে।

কিন্তু কি লাভ? এ দেশে তো রক্ষকই ভক্ষক। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কি জানেন না যে, নাবালিকার সম্মতি থাকলেও যৌন সম্পর্ক হলে তা ধর্ষণ। জানেন, জেনে-বুঝেই মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, হালকা কথা বলে অপরাধকে লঘু করে দিচ্ছেন। ভার্মা কমিশনের সুপারিশ ও পকসো আইনের ধারা এক্ষেত্রে যে কঠিন তা জেনে বুঝেই সরকার এ ধরনের অসংবেদনশীল মন্তব্য করেছে। এ ঘটনাটি কি শুধুই হাঁসখালিতে ঘটছে? না—সুজেট জর্ডন থেকে কামদুনি, সর্বত্রই একই ধরনের আচরণ রাজ্যের সুপ্রিমোর। তার মন্তব্যই তদন্তের দিক নির্দেশ করে দেয়। আর সেই পথেই সুজেট থেকে তুহিনা সকলের ন্যায় বিচার নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

আমরা জানি ধর্ষণের বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি ও শাস্তির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার হওয়া উচিত দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য। এই কোর্ট তৈরি হয়েছিল সেজন্যই। কিন্তু কোথায় সেই বিচার? এরাজ্যে একটাই শাসন। তা হল পার্টির শাসন। পুলিশ প্রশাসন আমলা সকলেই নীরব দর্শক। তাতেই তাদের প্রমোশন ট্রান্সফার ঠিক থাকবে। বুদ্ধিজীবীরা মেরুদণ্ড বিক্রি করে সুখে থাকবে আর মাটিয়া থেকে মালদা বাঁশদ্রোনী থেকে হাঁসখালির মেয়েদের যন্ত্রণা, কান্না, বিচারের দাবি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে।

আর যে প্রশ্নটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মেয়েটি কি মারা গিয়েছিল? না তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হল?

রাজ্যে একের পর এক ঘটনা ঘটছে মহিলা কমিশন, মানবাধিকার কমিশন কোথায়? পুলিশ এফ আই আর নেয় না। বিরোধীশূন্য গ্রামে মানুষের আওয়াজ শোনা যায় না, চাটাই মুড়ে মা-বাবার সামনে দিয়ে নাবালিকাকে নিয়ে যায় আর এই স্ব-শাসিত সংস্থাগুলি নীরব হয়ে থেকে যায়। অস্তিত্বের সংকটের ভয়ে তারা নির্বাক হয়ে আছে, এ ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। এ দুর্দশা এই সংস্থাগুলির আগে কখনো আসেনি। আজ যে কথাটা না বলে থাকা যাচ্ছে না তাহল, ধর্ষণের বিচারে যে আইন আছে বর্তমানে সেই আইন পাশ করতে কত লড়াই, আন্দোলন, ধর্না, অবস্থান নারী আন্দোলনের নেত্রীরা করেছিলেন তা চিন্তার বাইরে। আজ ক্ষমতার লোভ, তোলাবাজদের রাজত্ব, গুন্ডা কন্ট্রোল করা শাসক তার সবটাকে তছনছ করে দিল। বাহুবলী পুরুষতন্ত্র আর অর্থবলীরাই কথা কবে বাকি রবে নিরুত্তর।

করোনাকালে মানুষের দারিদ্র্য অভাব বেড়েছে। ভয়ানকভাবে বেড়েছে বাল্যবিবাহ, স্কুল ছুটের সংখ্যা। কর্মহীনতা মানুষকে ভয়ঙ্কর অসহায় করে তুলেছে। আর সেখানে নানা অনুদান প্রকল্প দিয়ে তাকে লোভী করে তুলছে এই রাজ্যের শাসক, কিন্তু তার কষ্ট দুর করতে তারা উৎসাহী নয়। কারণ মানুষের অভাব থাকলেই তো সে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কাছে যাবে এবং তাদের দেওয়া অনুদান নিয়ে খুশি থাকবে! তার অধিকারের লড়াই করতে ভুলে যাবে। একের পর এক নাবালিকা যখন ধর্ষিত হচ্ছে তখন শাসক অপরাধকে চাপা দিতে আরো বেশি করে অপরাধকে মদত দিচ্ছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নামে তার নির্যাতন তাকে জঘন্য অপমানের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছে। আর সমাজটা আরো একশ বছর পিছিয়ে যাচ্ছে।

এ লেখার কোন উপসংহার নেই। তাই নিবন্ধের শেষে বলতে চাই, এই লেখা লিখতে হচ্ছে এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে। চোখের সামনে প্রতিদিন নাবালিকা মেয়েদের উপর এই নির্যাতন অসহ্য হয়ে উঠেছে। কখনো সমাজ, কখনো রাষ্ট্র, কখনো পরিবারের দ্বারা সে নির্যাতিত হয়ে চলেছে। আর কতকাল এই অবস্থা চলবে? কন্যাশ্রী আছে আর কন্যার ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই, এই অবস্থা চলতে পারে না। এ কোন জঙ্গলে আমরা বাস করছি? বোলপুরের মেলা থেকে ফিরছে মেয়ে সেও ধর্ষিতা হল। একি কাণ্ড? আর এ নিয়ে বিক্ষোভ করলে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই ভগবানগোলা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আফরোজ সরকার বলছে, মিছিল করলে ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই তো এমন চলছে। বুক বাজিয়ে এরা মিডিয়ার সামনে একথাই বলছে। এদের তো পকসো আইনে অ্যারেস্ট করা উচিত। হচ্ছে কই? ভয়ে চাপে সন্ত্রাসে রাজ্যের সাধারণ মানুষ চুপ করে রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এই ধর্ষণ উপত্যকা আমার দেশ নয় আমার রাজ্য নয়।

আশার কথা এই যে রাজ্যজুড়ে বামপন্থী ছাত্র-যুব, মহিলারা আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন সেই আন্দোলনই আমাদের ভরসা। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে তাই আমাদের আবেদন—অগণিত নাবালিকা কন্যার শ্রী প্রতিদিন যারা কেড়ে নেয় বাংলার মানুষ তাদের কখনো ক্ষমা করতে পারে না। সেই ইতিহাস ঐতিহ্য তাদের নয়। ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। এই অপশাসনের অবসান ঘটাতে পথেই নামতে হবে। কবির ভাষায়—

"মুহূর্তে তুলিয়া শির
একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু
তোমা চেয়ে।
যখনই জাগিবে তুমি,
তখনই সে পালাইবে ধেয়ে।"

গরু একটি রাজনৈতিক প্রাণী

প্রয়াত ঐতিহাসিক ডি এন ঝা তাঁর রচিত 'The Myth of Holi Cow' পুস্তকে নিরামিষ আহার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, গরু একটি রাজনৈতিক প্রাণী। মুসলিম অথবা দলিত শ্রেণির মানুষদের সমাজের প্রান্তিক অবস্থানের দিকে আরও ঠেলে দেওয়ার লক্ষ্যেই এক ভ্রান্ত ধারণা জনমানসে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মুখ্যত উপরোক্ত শ্রেণির মানুষদের কাছেই গোমাংস প্রিয় খাদ্য। সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষজনের পছন্দের খাদ্য ছিল নিরামিষ খাদ্য এবং সমাজের বেশির ভাগ মানুষদের কাছে নিরামিষ খাদ্যের জনপ্রিয়তার জন্যই অহিংসা ভারতীয় সমাজজীবনের মূল চারিত্র বৈশিষ্ট্য। বস্তুত এমন কল্প কথার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষরাও যে গোমাংস এবং অন্যান্য আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত ছিল ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই তার অজস্র প্রমাণ দেখা যায়। সংবিধানের ২১ ধারায় বলা হয়েছে খাদ্য নির্বাচনের অধিকার জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। Identity Politics-এর নামে সমাজের একাংশ মানুষদের মূল জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে খাদ্য, পোশাক, বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের বক্ষপুটে আশ্রিত সমাজবিরোধীদের কণ্ঠে রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে ইদানীং। বিভাজন এবং শাসনের (Politics of Divide and Rule) পরিবর্তে সুশাসনের রাজনীতির সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনলেই সমাজজীবনের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। এই সত্যকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত গো হত্যা করা হয়েছে এমন সন্দেহে কোনও এক কৃষিখামারে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। দুষ্কৃতীরা নিজেদের 'গোরক্ষক'-এর পরিচয় জাহিরও করেছে। অনেকেরই হয়তো মনে আছে উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে ২০১৫ সালে মহম্মদ আখলাককে গোমাংস ফ্রিজে রাখার জন্য নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। এই দুই বিয়োগান্তক ঘটনার চরিত্র একই প্রকার, তবে এক্ষেত্রে একটাই পার্থক্য। সম্প্রতি স্বঘোষিত গোরক্ষকদের হাতে নিহত মানুষটির নাম "রাজারাম"। আমরা জানি, আখলাকের হত্যাকারীদের আজও কোনও শাস্তি হয়নি। অতএব রাজারামের হত্যাকারীরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। তাদের ক্ষেত্রেও কোনও ব্যতিক্রম না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে জেসিবি মেশিন দিয়ে বস্তী উচ্ছেদ

জাহাঙ্গিরপুরীতে গত শনিবার বজরঙ্গ দলের হনুমান জয়ন্তী পালনের উদ্দেশ্যে মিছিল থেকে এলাকায় হাঙ্গামা শুরু হয়। পুলিশ একতরফাভাবে এলাকার সংখ্যালঘু জনতার উপর হামলা শুরু করে। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। কারও বিরুদ্ধে আবার জাতীয় নিরাপত্তা আইনে মামলাও করা হয়। মঙ্গলবারই টের পাওয়া গিয়েছিল, উত্তর দিল্লির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে ৪০০ পুলিশ চেয়ে কিছু ভয়ংকর ঝামেলা পাকাবে। তাই ঘটল ২১ এপ্রিল অবৈধ নির্মাণ ও রাস্তার দোকানপাট ভেঙে দেবার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করবে। বুধবার অন্তত ৯টি জেসিবি মেশিন ও বুলডোজার নিয়ে এলাকায় ঢুকে সব তছনছ করতে শুরু করেছিল। কোনো নোটিশ ছাড়াই সব দোকানভাঙা শুরু হয়।

রামনবমীর সশস্ত্র মিছিলকে কেন্দ্র করে দিল্লীর জাহাঙ্গিরপুরী অঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, তাতে আক্রান্ত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। বাঙালি মুসলিম আত্মপরিচয় তাঁদের অসহায়তাকে বাড়িয়েছে। দিল্লী পুলিশ প্রথমে বলেছিল হিন্দু পরিষদ, বজরঙ দলের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হবে, তারপর হুমকির মুখে পিছিয়ে এসে দাবী করলো যে এই ঘটনায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের হাত রয়েছে। রামনবমীর মিছিলে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল দু হাত নেই, এমন একজন মানুষকে। এর পরে বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে দিল্লীর শাসকদল আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করা হলো—দিল্লীতে বসবাসকারী বাঙালী মুসলমান পরিযায়ী শ্রমিকেরা এই গণ্ডগোলের জন্য দায়ী, তাঁরা যেখানে থাকেন, সেইসব ঘর এবং মসজিদগুলো অবৈধ, এবং সেগুলো ভাঙতে হবে। এরই মধ্যে বিশিষ্ট আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি এবং মসজিদ ভাঙার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৌরসভা থামেনি, তাঁরা বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু করে। দিল্লি পুলিশের যুক্তি তারা কোনো সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ পাননি। ইতিমধ্যে বামপন্থী দলগুলোর সম্মিলিত প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে, ঢাল হয়ে আগুয়ান সেই বুলডোজারের সামনে দাঁড়ালেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য, কমরেড বৃন্দা কারাত। গণমানুষের প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিলেন অশীতিপর কমরেড হান্নান মোল্লা, তরুণ কমরেড ঐশী ঘোষ। ছিলেন লিবারেশনের দিল্লী রাজ্য সম্পাদক কমরেড রবি রাই এবং বিভিন্ন বামপন্থী দলের অসংখ্য ছাত্র-যুব কর্মীরা। অবাক করার মতো বিষয় হলো যে তৃণমূল কংগ্রেস বাঙালি মুসলমানের এককাট্টা ভোট পেয়ে রাজ্য শাসন করছে, তাদের লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে ৩৭ জন সাংসদ থাকা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনরকম ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। আপ এবং তৃণমূল যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দুই শাখা সংগঠন—একথা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীরপুরিতে পৌঁছে গেলেন আর এস এসের আর এক সহযোগী মিমের সর্বোচ্চ নেতা—আসাদুদ্দিন ওয়েইসি। সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ভাঙতে এই লোকটির জুড়ি মেলা ভার। দিল্লীর কমরেডদের এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ব্যারিকেড গড়ে তুলতে হবে। এবং বাংলার মানুষকেও বুঝতে হবে যে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগিতেই তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রাখবে। এ রাজ্যের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থরক্ষার্থে বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা আজ আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। তার জন্য অতীতের সমস্ত বিভেদ ভুলে সার্বিক বাম ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এবং এই কাজে বড়ো বামপন্থী শক্তিগুলির দায় তুলনামূলকভাবে বেশি

কেরালায় সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য ভাঙছে, বাড়ছে হিংস্রাশ্রয়ী কার্যকলাপ

কেরালায় বহুসম্প্রদায় ও জাতপাতভুক্ত গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে স্ব স্ব সামাজিক আচার আচরণ বজায় রেখে সহাবস্থান করে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজারাজড়াদের আমল শুধু নয় পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনেও সেই ধারা বজায় থেকেছে। এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ মূল ধারার রাজনৈতিক দলই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে বাহ্যত এই সামাজিক-সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য বজায় থাকলেও সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতাবাদ বনাম সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিদ্বেষের চোরা স্রোত বইছে।কয়েকদিন আগেই পালাক্কাড়ে আর এস এস প্রভাবিত দুর্বৃত্তদের সঙ্গে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পি এফ আই) এর সংঘর্ষে একজন পি এফ আই কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএম নেতা এম জি গোবিন্দন প্রকাশ্যে সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক যোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সমস্যা কিছুটা জটিল হয়েছে। আসলে এসব ক্ষেত্রে যারাই প্রথমে ঘটনা ঘটাক না কেন সরকার হিংসার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেই অভিযুক্ত করা এবং প্রমাণ সাপেক্ষে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এস এস বা পি এফ আই উভয়েই নিজেদের অরাজনৈতিক সংগঠন রূপে ঘোষণা করে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক পরিষেবা, জনকল্যাণ রিলিফ, শিক্ষার প্রসারের লক্ষ ঘোষণা করে। এভাবেই প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে এরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করবে। দেশে দীর্ঘদিন ধরে এই সব গোষ্ঠীসমূহ বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেটে লবির সহায়তা এবং ইদানীংকালে আর এস এস কেন্দ্রীয় সরকারি সহায়তায় সমাজে বিদ্বেষ, হিংসা, ধর্মীয় গোঁড়ামির আবহ নির্মাণ করছে। একমাত্র বামশাসিত রাজ্য কেরলে এই ধরনের বিষাক্ত পরিবেশ নির্মাণ করার প্রচেষ্টা চলছে বলেই বাম নেতৃবৃন্দের ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত দোষী দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে চিহ্নিত ও যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নতুন করে দেশভাগের চক্রান্তে লিপ্ত মোদি সরকার

১-এর পাতার পর

দেশের রাজধানীর পুলিশ প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে। দিল্লির রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। আর ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির দল পুনরায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ ক্ষমতা দখলের পর অমিত শাহকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে বসানো হয়। মোদির বিশেষ আস্থাভাজন অমিত শাহ। তিনি ২০০২-এর গুজরাত দাঙ্গা বা গণহত্যাকালে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আজও পর্যন্ত সেই কলঙ্কজনক গণহত্যার সম্যক বিচার হয়নি। এর কৃতিত্ব যেমন গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির, ঠিক তেমনই মোদির অতিঘনিষ্ঠ অমিত শাহরও। প্রায় দুই দশক পরে এখন একজন দেশের প্রধানমন্ত্রী আর অন্যজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষে। দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁরই। সেই দায়িত্ব তিনি কেমনভাবে পালন করছেন তা সকলেই জানেন।

মোদি-শাহ'র যুগলবন্দিতে ভারতের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত নিরাপত্তা হীনতা এবং সংবিধানের বিধান অনুযায়ী বাক্ স্বাধীনতা ও নিজের নিজের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশকে হিন্দি-হিন্দু- হিন্দুস্থান নির্মাণে আর এস এস প্ররোচিত মনোভঙ্গিতে মাতিয়ে তোলা হয়েছে। এজন্য অবশ্যই সমগ্র দেশের ভিত্তিতে চরম অসহিষ্ণুতা এবং ঘৃণার মনোভাব বিপুল গতিতে চলেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌজন্যমূলক সম্পর্ক পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দ্রুত। ২০১৯-এর পরে পরেই মোদি সরকার লোকসভায় ভালমন্দ জ্ঞানশূন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনৈতিকভাবে ব্যবহার করে আইন প্রণয়ন করেছে। মোদির দল জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ এবং ৩৫(ক) ধারা প্রত্যাহারই শুধু করেনি ওই রাজ্যটিকে তিন ভাগে ভাগ করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত হরণ করা হয়েছে। প্রতিদিন গভীর ষড়যন্ত্র চলছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করার। যেভাবে গুজরাত গণহত্যার পরে ওই রাজ্যের সংখ্যালঘু অংশের মানুষদের অধিকার শূন্য দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, এখন সমগ্র দেশে একই ব্যবস্থা চালু করতে উদগ্রীব মোদি ও শাহ। গুজরাত মডেলই একমাত্র আদর্শ।

এই পরমত অসহিষ্ণু মডেলকে জোর করে চাপিয়ে দিতে মানুষের মনে হাড় হিম করা সন্ত্রাস ও ভীতি নির্মাণ জরুরি। মানুষের জীবন সংশয় ঘটাতে পারলে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির পক্ষে সুবিধা। মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে তাঁদের সহায় সম্পত্তি ধ্বংস করলে মানুষ আপাতভাবে অনেক অনৈতিকতা মানতে বাধ্য হয়। দিল্লির আইন শৃংখলা ব্যবস্থার ওপর খবরদারির অধিকার অর্জন করে অমিত শাহ সেই অপকর্মই করে যাচ্ছেন।

বিজেপি উত্তর দিল্লি পৌরসভার নেতৃত্বে আছে। বিজেপি'র সংগঠন থাকলেও তাদের পক্ষে সরাসরি মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘাতে যাবার কোনো অজুহাত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মুসলিম মহিলাদের প্রতিবাদী ধর্না এবং রাস্তা জুড়ে এই আন্দোলনে অশান্তি সৃষ্টি করার তেমন কোনো অজুহাতও ছিল না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়ে জাতিগত মেরুকরণ নিশ্চিত করতে বিজেপি এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপির আঞ্চলিক নেতা জনৈক কপিল মিশ্র দিল্লি পুলিশের কাছে দাবি জানাতে থাকে যে, পথরোধ করে প্রতিবাদী ধর্না অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। পথ মুক্ত করতে হবে। এমন দাবি নিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করার এবং দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করতে থাকে।

অবশেষে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কপিল মিশ্রর মতো নেতার হুঙ্কার পরবর্তী হিন্দুত্ববাদী তস্করেরা ওই অঞ্চলের দরিদ্র মুসলিম মানুষদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা শুরু হয়। অত্যন্ত আতঙ্কজনকভাবেই দিল্লি পুলিশের উপস্থিতিতেই উত্তর পূর্ব দিল্লির এই ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় পুলিশ। দিল্লি পুলিশ বস্তুত দাঙ্গাকারীদের সহায়ক ভূমিকায়। তিনদিন যাবৎ মুহুর্মুহু আক্রমণ। গুলি, বোমা, তরোয়াল প্রভৃতি নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা একটা সময় পরে সংগঠিত হয়। প্রতিরোধের পথে যায়। বহুসংখ্যক মানুষ হতাহত। আতঙ্কে নিমজ্জিত জনসমাজ। কেউ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছেন না। আহত এবং মৃতপ্রায় মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থাও হতে পারছিল না। ২৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লি হাইকোর্ট থেকে পুলিশের প্রতি কঠোর নির্দেশ যে, সমস্ত আহত ব্যক্তির সম্যক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। সে বড় করুণ সময়।

সদ্য সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার পরেও দিল্লির পুলিশ অনৈতিকভাবেই দোষীদের গ্রেপ্তার করে নি। বেশিরভাগ মৃত মানুষের ধর্মীয় পরিচয় তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। আর পুলিশ, বোঝাই যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশে সেই সম্প্রদায়ের মানুষদের বিরুদ্ধেই শাস্তিযোগ্য আইনী ব্যবস্থা নিয়েছিল। এখনও, দু'বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও সেইসব সাজানো মামলার ফাঁদে পড়ে রয়েছেন বহুসংখ্যক মানুষ। এভাবেই দেশের কেন্দ্রস্থলে কুৎসিত সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলে মানুষকে বিভক্ত করা এবং তাঁদের সন্ত্রস্ত করে রাখার অপচেষ্টা চলছে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তিনি এমনকি, তাঁর অতি বিচিত্র 'মন কী বাতে'র মাধ্যমেও কোনো শঙ্কা প্রকাশ করেননি। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হিন্দুত্ববাদীরা মধ্যপ্রদেশের খরগোন, রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গা এবং খোদ দিল্লির অন্যান্য অঞ্চলে শঙ্কাহীন চিত্তে মানুষকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। জাহাঙ্গীরপুরীর ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও যুদ্ধ

ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ যত দীর্ঘতর হচ্ছে ততই ভেঙে পড়ছে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ। বিশেষ করে, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলের দর চড়ছে, খাদ্য সারের মূল্যবৃদ্ধি গত পাঁচ ছয় দশকের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। আবার এই অবস্থার সামাল দিতে যখন সুদের হার বাড়াতে যাচ্ছে, অধিকাংশ দেশ তখন আর্থিক উন্নয়নের গতি ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। আই এম এফ এই উন্নয়নের গতিহ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনাকে উল্লেখ করে জাতিসংঘ অদূর ভবিষ্যতে 'দুর্ভিক্ষের উত্তাল ঘূর্ণিঝড়ে'র সাবধানবাণী ঘোষণা করেছে।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ কোভিড-১৯ এর ধাক্কায় চরম বিপর্যস্ত। বেড়েছে গোষ্ঠী হিংসা, খুন, জখম, দারিদ্র। অধিকাংশ দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই অবস্থার মোকাবিলা করতে দিশাহারা এবং কার্যত ব্যর্থ। বেশ কয়েক বছর ধরেই এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। অতিমারির কবলে তা আরো কমেছে। ট্রাম্পের শাসনকালে ২০২০ সালে আন্তঃ আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্কে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন ট্রাম্পের আমলের মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। ফলে ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ কোনো ঐক্যবদ্ধ আর্থিক তথঅ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে ব্যর্থ।

ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা এবং পরবর্তীকালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা গ্রহণের বিষয়ে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মতানৈক্য রয়েছে। কয়েকটি দেশের সঙ্গে চিন ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর। তাছাড়া কিউবা, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশের ন্যাটো এবং ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী ভূমিকা সুবিদিত। আসল কথা এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। না হলে সারা বিশ্বেই ক্রমশ খাদ্যসংকট এবং শক্তির সংকট ঘনিয়ে আসবে।

রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ আবেদন

বামদলসমূহ সহ দেশের অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দল দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক হিংসা, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং বহুবিধ অশুভ দূরভিসন্ধির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। দেশবাসীর কাছে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যৌথ আবেদন রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট দলসমূহ নিজেদের দলীয় কর্মীদেরও সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক ও শ্রেণিস্বার্থে যারা ধর্মীয় মেরুকরণের অশুভ কৌশল গ্রহণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার হবার আহ্বান করেছে।

এই আবেদন পত্রে একই সাথে সীতারাম ইয়েচুরি, মনোজ ভট্টাচার্য, ডি রাজা প্রমুখ বাম নেতৃবৃন্দ তৃণমূল কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে স্বাক্ষর করায় স্বাভাবিকভাবেই বামপন্থী কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। তবে কি দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত দল তৃণমূল সম্পর্কে বামফ্রন্টের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাচ্ছে! অথবা বিগত লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনে যেসব বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি 'নো ভোট্টু বিজেপি' লাইনে তৃণমূলকে সমর্থন করে রাজ্যে গণতন্ত্রের জয়, ধর্ম নিরপেক্ষতার জয় বলে দু'বাহু তুলে কীর্তন করেছিল, তাদের রণকৌশলই বেছে নিলেন বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ?

তা কখনোই নয়। রাজ্যের বামফ্রন্ট কখনোই তৃণমূল সম্পর্কে তাদের অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, মোদির দল জাতীয় এবং কেন্দ্র সহ অনেকগুলো রাজ্যে শাসনক্ষমতায় থাকার সূত্রে রাষ্ট্রের সব কয়টি স্বাধীন স্তম্ভকে গত এগারো বছর ধরে ধ্বস্ত করে চলেছে। শুধু সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তিই নয়, আগ্রাসী নয়াউদারবাদের হিংস্র প্রকাশও বটে। সংবিধানের ফেডারেল কাঠামোর ভারসাম্য ভেঙে দেশে হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্থান নির্মাণের পথে চলেছে।

তাই শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক হিংসা রোধে বিজেপি'র বিরুদ্ধে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করে ন্যূনতম কর্মসূচি গ্রহণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। তা সত্ত্বেও আমরা কখনো ভুলব না যে ২০১৭ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির দায় তৃণমূলের। একইসঙ্গে পেছন থেকে রাজ্য তথা দেশের ক্রনি পুঁজিপতি সহ কর্পোরেট মিডিয়ার। মমতা ভোটবাক্স ভরাতে সংখ্যালঘু সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন না করলেও হালচালে তাদের তোষণের নাটক করেছেন। অন্যদিকে বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে রামনবমী হনুমানজয়ন্তী ইত্যাদিতে তাঁর আশ্রিত দুর্বৃত্তদের জঙ্গি হিন্দুত্বের বাহানায় তোলাবাজির নতুন নতুন সুযোগ খুলে দিয়েছেন। রাজ্য জুড়ে দুর্বৃত্ত পুলিশ আমলা নেতাদের দুষ্টচক্রের সহায়তার ভোটে যেকোনো অনৈতিক অশুভকর্ম ও গুণ্ডামি করে বিরোধীশূন্য করার কৌশল নিয়েছে। ফলে কর্পোরেট মিডিয়ার বাইনারি আর তৃণমূলের হঠকারিতায় ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি'র উল্কা সম উত্থান ঘটল। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের বাড়বাড়ন্ত দেখে রাজ্যবাসীর মনে একটা ভয় চেপে বসেছিল। বামপন্থীরা সেদিন বিজেপি বিরোধী প্রধান বিকল্প হিসেবে না দাঁড়াতে পারায় রাজ্যবাসী তৃণমূলকেই বেছে নিয়েছিল। বহু কোটি টাকা খরচ করে মিডিয়ার প্রচার তৃণমূল ও বিজেপি এই দুই পক্ষের মধ্যে সীমিত রেখেছিল। বামপন্থীদের কোনও- ভাবেই মাথা চাড়া দিতে দেওয়া যায় না।

এভাবেই দুটো প্রতিক্রিয়াশীল দল রাজ্য বিধানসভা থেকে বামপন্থীদের বিলুপ্ত করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে গল্পটা আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করেই বদলে যাচ্ছে। বিজেপি'র মোহ দ্রুত কাটছে। ওদিকে এত দান ধ্যান সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্যের দুর্বৃত্তদের আন্তর্সংঘর্ষ ও নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার অসহনীয় হয়ে পড়ছে।

পুলিশের ওপর ভরসা হারিয়েছে মানুষ। প্রতিটি খুন ধর্ষণের তদন্তে সিবিআই তদন্তের দাবি উঠছে। অন্যদিকে ৩৫৫ আর ৩৫৬ ধারার দাবি উঠেছে। সিবিআই ইডি কাদের নির্দেশে চলে জানা সত্ত্বেও এই দাবি ওঠা মানে বকলমে সিবিআইকে সামনে রেখে নতুন করে বাইনারি সৃষ্টির পরিকল্পনা তৃণমূল আর বিজেপি'র। সুতরাং অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বিজেপি'র বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে মমতাও তাদের সঙ্গে গা- ঘেঁষাঘেঁষি করার সুযোগ হারাতে রাজি নয়। রাজ্যবাসী প্রতিদিনের লাঞ্ছনা নিপীড়ন গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া প্রতিটি গণআন্দোলন ও ধর্মঘটের বিরোধিতার নিরিখে তৃণমূলের প্রকৃত অগণতান্ত্রিক চরিত্রের মুখোশ খুলে দিতে হবে।

এই যৌথ আবেদন সত্ত্বেও কর্পোরেট ক্রোনি পুঁজিপতি আশ্রিত দুর্বৃত্ত দলটির বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র করার পাশাপাশি আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী দলের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের মুখ্য শক্তি হয়ে ওঠা আটকায় না। মনে রাখতে হবে এর মধ্যে কম শত্রু বনাম বেশি শত্রুর কৌশল নেই। এই যুদ্ধে দুটি প্রতিক্রিয়াশীল দলই একটা যুদ্ধে ক্ষমতার জন্য লড়ছে। খুবই কম সময়ের জন্য এটাকে কাজে লাগাতে হলে গণসংগ্রাম শ্রেণিসংগ্রামে শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে বামপন্থী সহ সমস্ত বিরোধী দলের আহ্বান—

আমরা নিম্নোলিখিত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিম্নলিখিত আবেদন করছি।

আমরা যেভাবে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিধান, বিশ্বাস, উৎসব, ভাষা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়কে প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজকে উদ্দেশ্য- প্রণোদিতভাবে মেরুকরণ করা হচ্ছে, তার জন্য অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করছি।

আমরা প্রত্যহ লক্ষ করছি কিভাবে কিছু ব্যক্তি ক্রমাগত ঘৃণা ও দ্বেষ বৃদ্ধিকারী ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন, এরা অধিকাংশই সরকারের প্রশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়ার ফলে এদের বিরুদ্ধে কখনই প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

দেশের কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক হিংসার বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমরা তীব্রতার সঙ্গে এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার নিন্দা করছি। আমরা এইসব ঘটনার সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের ধারাক্রম থেকে বুঝতে পারছি প্রতিটি হিংসার ঘটনার পিছনে বিশেষ অশুভ শক্তির চক্রান্ত রয়েছে। প্রতিটি আগ্রাসী প্রকৃতির সশস্ত্র ধর্মীয় মিছিলের সূত্রপাত হয়েছে কারো না কারো হিংসাবর্ধনকারী ভাষণের মাধ্যমে।

আমরা, যেভাবে সামাজিক অডিও ভিসুয়াল বৈদ্যুতিন মঞ্চগুলিকে সরকারি প্রশ্রয়ের ক্ষমতায় হিংসা এবং কুসংস্কার প্রভৃতি অসংস্কৃতিমূলক বিষয়কে ক্রমাগত প্রচার করা হচ্ছে, তার জন্য ভীষণই আশঙ্কিত।

প্রধানমন্ত্রী যেভাবে গভীর নীরবতা অবলম্বন করছেন, সেই ধরনের ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী সম্পর্কে যারা ক্রমাগত এদের কথাবার্তা চালাচালির মধ্য দিয়ে ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি দ্বারা মানুষকে তথা সমাজকে উত্তেজিত করে হিংসাশ্রয়ী কাজকর্মে লিপ্ত করাচ্ছেন, তাতে আমরা যারপরনাই মর্মাহত।

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই যে, আমাদের যৌথ এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারাই বহু শতাব্দী প্রাচীন এই দেশের সমুন্নত ঐতিহ্যের ধারাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। আমরা এই বিষাক্ত দর্শনপ্রসূত সমাজকে বহুধা বিভক্ত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দায়বদ্ধ।

আমরা পুনরায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, যদি সমাজে শ্রদ্ধা, সহনশীলতা সহ দেশের স্মরণীয় বৈচিত্রের পূর্ণ বিকাশের পরিবেশ রচনা করতে পারে তবে, আমাদের দেশ সুনির্দিষ্ট ভাবেই প্রগতি ও বিকাশের ধ্বজা বহন করতে সক্ষম হবে।

আমরা তাই এ মুহূর্তে দেশের প্রতিটি অংশের মানুষের কাছে শান্তিরক্ষার আবেদন জানাই। এই অশুভ প্রচেষ্টা এবং যারা এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করার পথকেই বেচে নিয়েছে তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই। আমাদের প্রতিটি দলের প্রতিটি শাখা ও স্থানীয় সংগঠনসমূহকে এককভাবে, এবং অবশ্যই যৌথভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিরক্ষার জন্য এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই।

স্বাক্ষরকারী—

শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী, সভাপতি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

শ্রী শারদ পাওয়ার, সভাপতি ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি।

শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রী এম কে স্ট্যালিন, মুখ্যমন্ত্রী, তামিলনাড়ু।

শ্রী সীতারাম ইয়েচুরি, সাধারণ সম্পাদক, সিপিআই (এম)।

শ্রী হেমন্ত সোরেন, মুখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খন্ড।

ড. ফারুক আবদুল্লা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, জম্মু ও কাশ্মীর।

শ্রী তেজস্বী যাদব, বিরোধী নেতা, বিহার, আর জে ডি।

শ্রী ডি রাজা, সাধারণ সম্পাদক, সি পি আই।

শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক, এ আই এফ বি ।

শ্রী মনোজ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, আর এস পি।

শ্রী পে কে কুনহালিকুট্টি, সাধারণ সম্পাদক, আই ইউ এম এল

শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন।

পদদলিত মানবাধিকার

সারা দেশ এক মর্মান্তিক সাজার সাক্ষী হয়ে রইল। ২০০৮ সালের আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ মামলায় বিশেষ আদালত এক সঙ্গে ৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। মানবাধিকার রক্ষা কর্মী সহ দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ বিচারের নামে এই প্রহসনকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে। গুজরাতে ২০০২ সালে গণহত্যার মামলার রায়ের সঙ্গেই এমন ঘটনা তুলনীয়। ঐ দাঙ্গায় ২০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন এবং সারা রাজ্যে তিন মাস ধরে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল। গুজরাতের গণহত্যার নৃশংস ঘটনায় ১৫০ জন দুষ্কৃতী অভিযুক্ত হলেও দাঙ্গা ঘটানোর জন্য একজন অপরাধীও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় নি। ২০০৮ সালে এই একই রাজ্যে (আহমেদাবাদ শহরে) উপর্যুপরি বোমা বিস্ফোরণে ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই বোমা বিস্ফোরণের মামলায় সাজা প্রাপ্ত ৪৯ জনের মধ্যে ৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার মতো অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। বাকী ১১ জনের আজীবন কারাদণ্ড হয়েছে। একটি মামলায় এক সঙ্গে এতগুলি মানুষের মৃত্যুদণ্ড মর্মান্তিক এবং অভূতপূর্ব এক ঘটনা। এর সঙ্গে একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী হত্যা মামলায় ২৬ জনের মৃত্যুদণ্ডের তুলনা করা যেতে পারে। এক সঙ্গে পাইকারি হারে এই মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে মানবাধিকার রক্ষা কর্মী এবং গুজরাতের মুসলিম সমাজের প্রশ্ন, ২০০২ সালের গণহত্যার মামলায় একজন অপরাধীরও শাস্তি হয় নি, অথচ ২০০৮ সালে আহমেদাবাদের বোমা বিস্ফোরণে পাইকারি হারে ৩৮ জনের মৃত্যুদণ্ড হল। অপরাধীরা মুসলিম সমাজভুক্ত বলেই কী আমাদের বিচার ব্যবস্থায় এই প্রহসন ঘটানো হয়েছে? এই দেশের বিচার ব্যবস্থায় এ এক কলঙ্কজনক ঘটনা বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলেও, এই একপেশে বিচারের ঘটনা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করছে যার কুফল নাগরিক সমাজকেই ভোগ করতে হবে। প্রসঙ্গত আহমেদাবাদ বোমা বিস্ফোরণ মামলার রায় ঘোষণার পর আহমেদাবাদের মানুষদের একাংশের মধ্যে আনন্দের জোয়ার এবং বিজয়োৎসবে মত্ত হতে দেখা যায়। ধর্মীয় জিঘাংসা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে! এমন দুঃসহ ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। ডজনখানেক ফেজ টুপি পরিহিত মানুষদের একসঙ্গে গলায় দড়ি বেধে রাস্তার পাশে ঝোলানো অবস্থার ব্যঙ্গ চিত্রও দেখা গিয়েছে। ব্যঙ্গ চিত্রের নীচে "সত্যমেব জয়তে" লিখতেও দুষ্কৃতীরা ভোলে নি। গুজরাত রাজ্যে সামাজিক মেরুকরণের প্রক্রিয়াটির অপকর্ম যে সমাপ্ত হয়েছে, নিঃসংশয়ে তা বলা যেতে পারে।

Vol. 68 Issue No. 49 শনিবার ১৬ এপ্রিল, ২৩ এপ্রিল ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

ধর্ষণ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জীর কুৎসিত মন্তব্য নতুন কিছু নয়

সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের স্মৃতিগুলো ক্রমশ ঝাপসা হতে থাকে। এক সময় সেগুলো আর মনেও পড়ে না। কোনো পরিসংখ্যানবিদ অথবা ইতিহাসের গবেষক হয়তো কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাঁদের সংগ্রহের মধ্যে সন্নিবেশিত করেন। সেসবও তাঁদের পছন্দ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। সব কিছু স্থান পায় না। অনেক প্রসঙ্গ এভাবেই চিরতরে হারিয়ে যায় ইতিহাসের অতল গহ্বরে। সেসবের হদিশ করা প্রায় অসম্ভব কিংবা বেশ পরিশ্রমসাধ্য। ২০১১ সালের পরিবর্তিত সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকেই যা হয়ে চলেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণে নজর রাখলে যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আঁৎকে উঠবেন। বিশেষ করে এ রাজ্যের নারী সমাজের বিরুদ্ধে নারকীয় আচরণ শুরু হয়ে যায়।

মনে পড়ে, ২০১২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার জনাকীর্ণ পার্কস্ট্রীট অঞ্চলে সুজেট জর্ডন নাম্নী এক মহিলা দুষ্কৃতীর দ্বারা নির্যাতিতা এবং লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। তিনি ওইসব নারকীয় প্রবৃত্তির দুষ্কৃতীদের থেকে কোনক্রমে ছাড়া পেয়ে দৌড়েছিলেন পুলিশের কাছে। কোনো সুরাহাই হয়নি তাঁর অভিযোগের। অকুস্থলের কাছেই দীর্ঘ বহু বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকারের দায়িত্বে থাকা প্রখ্যাত আইনবিদ হাসিম আবদুল হালিমের বাসস্থান। সুজেট অগত্যা তাঁর পরিচিত হালিম সাহেবের ছোট ছেলের কাছে দৌড়ে গিয়েছিলেন। সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন নির্যাতিতা। রাত্রি গভীরে এক বিধ্বস্ত নারীকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু। পরের দিন কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে এমন এক জঘন্য ঘটনার সংবাদ ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

কী বলেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী? তা কি এতদিন পরে আর মনে পড়ে? এই দুঃসংবাদ সম্পর্কে প্রথমেই তিনি বলেছিলেন ‟এমন কোনোকিছুই হয় নি। এসব তাঁর বিরোধী বামপন্থীদের সাজানো ঘটনা।” তাঁরই নিয়ন্ত্রণে থাকা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করার কথা তিনি বলেন নি। তাঁর ঘনিষ্ঠ সাঙ্গাৎ তৎকালীন মন্ত্রী মদন মিত্রকে দিয়ে বলিয়েছিলেন যে, ওই মেয়েটি অসৎ চরিত্রের। ও এসকর্টের কাজ করে। দরদামে পোষায় নি বলে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে। অতীব বিকৃত রুচির বশবর্তী হয়ে এমন কুৎসিত মন্তব্য। নির্যাতিতার ওপরেই সবকিছুর দায় চাপিয়ে, তাঁকে কলঙ্কিত করে প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি চাপা দেবার অসৎ প্রচেষ্টা।

ঘটনাক্রম এখানেই থেমে থাকেনি। মুখ্যমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করলেও কলকাতা পুলিশের তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেন প্রাপ্ত অভিযোগের তদন্ত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, সুজেট জর্ডনের ওপর চরম নির্যাতন হয়েছে এবং দোষীদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়লেও মূল অভিযুক্তরা পালিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁরই মন্ত্রকের এক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকের এমন কৃতিত্ব প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে দেখেন নি। ঠিক উল্টো পথে হেঁটে তাঁর মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করার পর দময়ন্তী সেনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার লক্ষ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁকে অতি দ্রুত কলকাতা পুলিশের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে অনেক কম মর্যাদার এক পদে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এমন এক অনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার ফেলে তাঁর ‘কন্ট্রোলে’ থাকা তৃণমূলী গুন্ডাবাহিনী বর্ধিত সাহস পেয়ে ধারাবাহিক কুকর্মে মেতে ওঠে। তারা নির্ভয়ে সমস্ত অন্যায় কাজ করার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। অন্যদিকে কলকাতা এবং রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে বার্তা দেওয়া হয় যে, কোনো নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি ঘটলেও চট করে কোনো তদন্ত করা চলবে না। অর্থাৎ, পুলিশ বাহিনীর যতটুকু মেরুদণ্ড তখনও অবশিষ্ট ছিল তা গুঁড়িয়ে দিয়ে সমগ্র বাহিনীকেই দলদাসে পরিণত করার প্রক্রিয়া বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে চলতে থাকে।

মনে পড়ে, পার্ক স্ট্রীটের এমন এক অঘটনের পর থেকেই একাদিক্রমে কামদুনি, খড়গ্রাম, মধ্যমগ্রাম এবং আরও বহুস্থানে লাগাতার ধর্ষণ নিপীড়ন ও নির্যাতনের অনায়াস লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে পড়েন পশ্চিমবঙ্গের নানা বয়সের নারী। কলকাতা শহরের পথশিশুও রেহাই পায় নি। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করা যায় যে, অতি নোংরা স্বভাবের সমাজবিরোধীরা সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করার জন্য বহু ক্ষেত্রেই আক্রান্তদের নির্মম হত্যা করে চলে। অতি আতঙ্কের পরিবেশ গ্রাস করে পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজকে। কোনো প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থাই রাজ্য সরকার নিতে ব্যর্থ। কত ঘটনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়! দুষ্কৃতীদের প্রায় একশ শতাংশই সরকারী ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনী। তারা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ন্যূনতম ভয়ডর বা সংকোচের চিহ্ন মাত্রও নেই।

মাঝে অল্প কিছুকাল শাসক দলের প্রশ্রয়প্রাপ্ত লুম্পেনদের অবৈধভাবে নারী সমাজের ওপর আক্রমণে কিছুটা ভাটা পড়লেও তাদের নারকীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পথে তারা সর্বদাই থেকেছে।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পরে নতুন করে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের কলঙ্কজনক অপকর্মে মেতে উঠেছে নানা স্তরের তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা। উদ্দাম, বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সাহস পাচ্ছে কারণ, রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে বিরাজিত রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ২০১২ সালের পার্ক স্ট্রীট কান্ডে যা ছিল, এখনও ঠিক তাই। গত ৪ এপ্রিল নদীয়া জেলার হাঁসখালিতে যে কিশোরী গণধর্ষণ ও চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য মমতা ব্যানার্জী করেছেন তা যেকোন শুভবোধসম্পন্ন মানুষের বিবমিষার উদ্রেক করে। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লজ্জাহীনাই শুধু নয়, তাঁর পারিবারিক রাজনৈতিক ব্যবসা বলবৎ রাখতে হলে হয়তো এছাড়া কোনো পথ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে যে দ্রুততার সঙ্গে সামাজিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে তা আশঙ্কার। শুধু গ্রাম গ্রামান্তরেই নয়, কলকাতা শহরের নানা প্রান্তে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা কখনও সিন্ডিকেটের নামে কখনও বা তোলাবাজি চালিয়ে যেতে যা খুশি তাই করে চলেছে। ব্যক্তিগতস্তরে বখরার গণ্ডগোল হলেই একে অপরের ওপর সশস্ত্র হামলা চালাচ্ছে। রাজ্যপুলিশ সব দেখে শুনেও অসহায়ভাবে নিশ্চুপ। তাদের কাছে বিবদমান দু’পক্ষই যে শাসকদলের। পুলিশ বাহিনীর একাংশও এখন লুঠপাটের অবৈধ কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সিভিক পুলিশ নামে যারা নানাস্থানে সাধারণ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করছে তারা অধিকাংশই তৃণমূল আশ্রিত। সবাই দুষ্কৃতী নাও হতে পারে। কিন্তু এটা সবাই মানছেন যে, এই সব সিভিক পুলিশ নানাভাবে চলমান দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই এরা তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের সঙ্গে মিলে মিশে অপরাধমূলক কাজ করে যাচ্ছে। একধরনের পুলিশী উর্দি তাদের সুবিধা দিচ্ছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একাই রাজ্য প্রশাসন চালাতে তৎপর। মন্ত্রীসভা যা আছে তা শুধুই ‘শো পিস’। অন্য কোনো মন্ত্রীর তেমন অস্তিত্বই নেই। সবটাই মালকিনের ইচ্ছা অনিচ্ছার বশবর্তী। এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের চাপে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমনিতেই সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ জীবন জেরবার। তার ওপর সাম্প্রদায়িক হানাহানি, সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণাবর্ষণ, বিদ্বেষ প্রভৃতি বিপুল বেগে বেড়ে চলেছে। এসবের থেকে নজর ঘুরিয়ে দিয়ে বাংলার মানুষকে স্তব্ধ করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলার তৃণমূল নেত্রী। নাগপুরের কর্তাদের পরামর্শ বা নির্দেশ শিরোধার্য করে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এসব প্রসঙ্গে বামপন্থীদের আরও বেশি হৃদয়ঙ্গম করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করে এগোতে হবে।

নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের ডাকে রাজ্যব্যাপী হাঁসখালির ঘটনার প্রতিবাদ

নদীয়ার হাঁসখালিতে ১৪ বছরের কিশোরীর ধর্ষণ, খুন এবং ময়নাতদন্ত না করে মৃতদেহ দাহ করা, পরিবারের লোকদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে থানায় অভিযোগ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ না করতে দেওয়া এবং সারা রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটার প্রতিবাদে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ গত ১১-১২ এপ্রিল রাজ্যব্যাপী কালা দিবস পালন করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মহিলারা পুলিশ প্রশাসনের দপ্তরে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজি’র কাছে একটি প্রতিনিধি দল অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। যদিও সরকারের দলদাস এই পুলিশের ডিজি সরাসরি ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করেন এবং ডি আই জি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার) ডেপুটেশন গ্রহণ করে জানান এ বিষয়ে কিছু বলতে তারা অপারগ, স্মারকলিপি তাঁরা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা সর্বানী ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদিকা সুস্মিতা রায় এবং শিখা মুখার্জী।

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ সভা। গত ১১ এপ্রিল নদীয়া জেলার রানাঘাট কোর্টে হাঁসখালির অভিযুক্তকে তোলা হলে কোর্টের সামনে মহিলা সংঘের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ জানানো হয় এবং রানাঘাট মহকুমা শাসকের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। ঐদিন এই বিক্ষোভ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন করবী সেন, ভবানী বর্মন সহ নেতৃবৃন্দ। ঐদিনই কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মোমবাতি নিয়ে অবস্থান হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন নদীয়া জেলা সম্পাদক ছায়া রায়, ঝর্ণা ঘোষ সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

দক্ষিণ দিনাজপুর

এই জেলার তিন জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। হিলি, বালুরঘাট এবং তপনে। দক্ষিণ দিনাজপুরে বিভিন্ন ব্লকে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সভানেত্রী কম. সুচেতা বিশ্বাস, জেলা সম্পাদিকা চঞ্চলা ঘোষ, রাজ্য কমিটির সদস্য বিজলী দে, শিপ্রা সেন সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

কলকাতা জেলা

যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে কলকাতা জেলা মহিলা সংঘের নেতৃত্বে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদিকা সর্বানী ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদিকা সুস্মিতা রায়, রাজ্য কমিটির সদস্য রমা ঘোষ, বুলা শীল, শিখা মুখার্জী সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

মুখ্যমন্ত্রীর অসংবেদনশীল মন্তব্য ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি , মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম, হুগলীর শ্রীরামপুর ও খানাকুল সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন জেলায় রাজ্য কমিটির সদস্য মদিনা বেগম, তৃপ্তি পান্ডে, শ্যামলিমা সরকার, টুম্পা খালুয়া সহ মিত্রা চ্যাটার্জী, জ্যোৎস্না সাঁতরা প্রমুখ নেতৃত্বে ছিলেন।

১৪ এপ্রিল নদীয়া হাঁসখালিতে মহিলা সংঘ সহ ছাত্র ও যুব সংগঠন পি এস ইউ ও আর ওয়াই এফের সঙ্গে যৌথভাবে থানা ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ হয়। একইসঙ্গে অফিসার ইনচার্জের কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে প্রতিনিধিদল পরিবারের সুরক্ষা এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। যদিও কোর্টের নির্দেশে আপাতত সি বি আই তদন্ত শুরু হয়েছে। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন নদীয়া জেলার সভাপতি করবী সেন, জেলা সম্পাদিকা ছায়া রায়, আরতি রাউত, জরিফা বেওয়া সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব। নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ লাগাতার রাজ্যব্যাপী নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখে পথেই থাকবে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-